পুত্রেরাতো কিছুই বলিতে পারে না। হিন্দুগৃহে পুত্রেরা নিজেই পরাধীন এবং জননীর ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ। তাহাদের নিজেদের স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। গৃহিণীরা এটাও বোঝেন না যে, কালে ইহারও একটা বিষময় ফল ফলিবে। সেই বালিকা পুত্রবধূরা বয়ঃস্থা হইয়া যখন ৪।৫টী সন্তানের জননী হইবেন, তখন তাঁহাদের মানসপটে যে 'শুচি বাযির' ছায়া পড়িয়া যায়, তাহার বিষম কুফল এই হইবে যে, হতভাগিনীদিগকে নিজেদের 'ব্যাধি' লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা কখনইবা স্বামী পুত্রের সাহায্যের সময় পাইবেন, এবং কখনইবা তাঁহাদের সংসারের কর্ত্তৃত্বভার লইবার অবসর হইবে।

এতো গেল 'শুচি ব্যাধির' কথা। তাহার পর পিতা মাতার দেনা পাওনার বিষয় লইয়াও বধূর যে নিগ্রহ হয়, তাহা বর্ণনাতীত। অনেক স্থলে জনক জননী আদৌ বুঝেন না যে, তাঁহাদের সন্তানগণ নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে সকলেই সংসারের সাহায্য করিতে প্রয়াসী। ইহা কাহারও বলিবার বিষয় নহে। যাহার যেরূপ সঙ্গতি, সে সেই রূপই দিবে। তাহাদের সহিত অর্থ লইয়া বিবাদ বড়ই নীচত্বের পরিচায়ক। এইরূপে অর্থের জন্য সন্তানদিগের সহিত কলহ না করিয়া তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হইলে, অর্থাৎ পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে এমন অর্থ আনিতে পারিলে, তাহাদিগের বিবাহ দিলে কোন অনর্থই হয় না। যে কাপুরুষ নিজ স্ত্রীর ন্যায্য অভাব মোচন করিতে অক্ষম, এবং অর্থের জন্য যাহার স্ত্রীকে শ্বশ্রুর গঞ্জনা শুনিতে হয়, তাহার পক্ষে বিবাহ করাই বিড়ম্বনা মাত্র। আজ ভারতের এতাধিক দারিদ্রতাও সেই জন্য। ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম নাই বলিয়াই সে দেশের লোক এত উন্নত।

বধূ যদি ভদ্র বংশের এবং ভদ্র পরিবারের কন্যা হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন বড়ই দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। কেননা এ সকল বিষয়ে সে হয় তো একেবারেই অনভ্যস্ত। তবে অশিক্ষিতা মাতার কন্যা হইলে তাহার ততটা কষ্ট হয় না। কেননা সে পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া আছে এবং ভ্রাতৃবধূদের উপর জননীর ব্যবহার দেখিয়া হয় তো শ্বশ্রুর নিকট সেইরূপ ব্যবহার পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই থাকে। আর যে ভদ্র পরিবারের কন্যা শিক্ষা দীক্ষা সকল বিষয়েই ভদ্রোচিত ভাব পাইয়াছে, তাহার পক্ষে এরূপ ব্যবহার নূতন ও অদ্ভুত এবং কষ্টকর। কেননা, যে যেরূপ ভাবে প্রতিপালিত হয়, এবং শিক্ষা দীক্ষা পায়, সে তাহার বিপর্য্যয় দেখিলেই নূতন ও অদ্ভুত মনে করে। সে যাহা কখনও কল্পনাতেও ভাবিতে পারে নাই, সেই সকল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া যায়।

এ তো গেল মেয়েদের কথা, তাহা ছাড়া বধূকে পিত্রালয় পাঠাইবার সময় এক

ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বধূর কোন আত্মীয় বা ভ্রাতা আনিতে গেলে, তাহাকে অনেক সময় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিতে হয়। বধূর পিতা মাতা গৃহিণীকে যথাবিহিত সম্মান দেখাইয়া এবং রৌপ্য মুদ্রার শ্রাদ্ধ করিয়াও তাহার বিনিময়ে শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন না। আমার গত ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি যে, বহু ভদ্র পরিবারের ভিতর এই সকল নীচ ও ইতরজাতীয় ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। নব বধূর স্বামিগৃহে আগমনের পর অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারে ঝি ও পাচিকার সংখ্যা কমিয়া যায়, এবং সেই ঝি ও পাচিকার কার্য্য নববধূ দ্বারাই সম্পন্ন করান হয়। কি ভয়ানক অত্যাচার! যত কিছু নীচ কার্য্য তাহা করিয়াও তাহার অব্যাহতি নাই। তাহার উপর আবার বাক্যযন্ত্রণা এবং প্রহার পর্য্যন্তও অদৃষ্টে লাভ হইয়া থাকে।

কোন বালিকার যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ সে যদি স্বামীর স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করে এবং সেই সঙ্গে সকল নীচ কার্য্যে অভ্যস্ত থাকে, অর্থাৎ সে যদি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান হয়, তাহা হইলে আর তাহাকে ততটা কষ্ট পাইতে হয় না। স্বামীর স্নেহে শ্বশ্রুদেবীর বাক্য সুধা বর্ষণ সহিবার ক্ষমতা হয়। আর যাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ 'স্বামিপ্রণয়'ও মিলে না, সে যদি নীচ কার্য্যগুলিতেও অনভ্যস্ত হয় তাহা হইলে তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। ধনী এবং ভদ্র পরিবারের সন্তান হইলে, ধনী পিতা হয় তো কেবল মাত্র এম্.এ,বি,এ, পাস দেখিয়াই ভুলিয়াছিলেন, বংশ চরিত্র কিছুই দেখেন নাই।

অনেক বধূর পরিধান বস্ত্র এমন অব্যবহার্য্য ও মলিন দেখিয়াছি যে, তাহা ভদ্র লোকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারেন না। কিন্তু বাড়ীর কাহারও সে দিকে লক্ষ্য থাকা দূরের কথা, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরাও একটা মহা অপরাধের বিষয় বলিয়া মনে করা হয়! বঙ্গদেশে প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই ধোপার খরচে এত কার্পণ্য যে, সেরূপ অন্য দেশে খুব কমই দেখা যায়। মোট কথা সকল প্রকারের যত কিছু যন্ত্রণা দেওয়া যাইতে পারে, সেই সকলই বালিকা বধূর উপর দিয়া যায়।

বধূর প্রতি অত্যাচার প্রত্যেক হিন্দু গৃহের মধ্যেই দেখা যায়। আমার ধারণা ছিল, হিন্দুস্থানে হিন্দুস্থানী মহিলাদিগের মধ্যে এরূপ ঘটে না। কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিয়াছি যে, বঙ্গগৃহ অপেক্ষা হিন্দুস্থানের বধূদিগের প্রতি যন্ত্রণার মাত্রা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

বয়ঃস্থা গৃহিণীদের মুখে শুনা যায় আজ কালের বধূরা শ্বশ্রু, দেবর ও ননদের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মেও বড় শিথিলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ সকল কথা সত্য হইতে পারে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই! শিক্ষা ও দীক্ষা অনুসারে ভদ্র ও অভদ্র

পরিবারের কন্যাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়। কিন্তু বধূদিগের প্রতি শ্বশ্রূদিগের রূঢ় ব্যবহারই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। তাহার কোন ভুল নাই! কারণ যাহারা বালিকা বয়েসে শ্বশ্রূর নিকট যত অধিক যন্ত্রণা পাইয়াছে, তাহারাই বয়ঃস্থা হইয়া শ্বশ্রূর প্রতি তত শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় দিয়া থাকে।

কর্ত্তব্যে শিথিলতার একমাত্র কারণ অশিক্ষিতা মাতার সন্তান বলিয়া শিক্ষার অভাব। অনেক মাতা মনে করেন যে, শ্বশুরালয় গিয়া কন্যাকে তো খাটিতেই হইবে, সুতরাং তাঁহার গৃহে তাহার আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনেই করেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অশিক্ষা এ সকলের একমাত্র কারণ।

হিন্দুসমাজে যদ্যপি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধান করা হয়, এবং ছাত্রজীবনে যুবকদিগকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করিয়া, উপযুক্ত বয়সে উপার্জ্জনক্ষম হইলে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে শিক্ষিতা রমণী বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বধূযন্ত্রণা শেষ হয়। মোট কথা, বাল্যবিবাহ-প্রথা এককালে উঠিয়া যাওয়া উচিত। নতুবা হিন্দুগৃহে বধূর যন্ত্রণা চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। সকলেই জানেন যে, বহু পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ঘরে ঘরে বধূদিগের প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচারের কথা শুনা যাইত। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজকাল ভারতের প্রত্যেক জাতিই পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু না কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু হিন্দুগৃহে বধূর যন্ত্রণা পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আশা করি, হিন্দু ভগিনীগণ আমার এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সতর্ক হইবেন এবং ঘরে ঘরে শিক্ষিতা মাতা ও শিক্ষিতা শ্বশ্রূগণ নিজ নিজ কন্যা ও পুত্রদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দান করিয়া যন্ত্রণারূপ অত্যাচার হিন্দুর গৃহ হইতে উঠাইয়া দিবেন।

তাহা হইলে তাঁহারা দেখিবেন যে, বধূর নিকট কিরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। তাঁহারা আরো দেখিবেন যে, প্রতি বঙ্গগৃহ কিরূপ সুখ ও শান্তির ভবন হইয়া উঠিবে।

বালিকা-বয়সে ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হৃদয় কখন বয়ঃস্থা হইলে প্রসারিত হইয়া শ্রদ্ধা প্রীতি দিতে পারে না। তাহারই মধ্যে শ্বশ্রূদেবীরা যেটুকু লাভ করেন, সে কেবল একমাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে, এবং স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য বধূরা করিয়া থাকে।

ভগিনীগণ! আপনাদিগের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না। হিন্দুগৃহে বধূর যন্ত্রণা বা শাস্তি যাহাতে লোপ পায়, সকলের সেই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমার এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য! ভগবৎকৃপায় আমাকে কখন বধূযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু কয়েকটী পরিবারের মধ্যে যে সকল

দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাতে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। মনুষ্য সৃষ্টির উন্নত জীব হইয়া এ সকল যে বুঝে না ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। স্নেহ মমতা পাইলে বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত তাহার প্রতিদান করিয়া থাকে, তবে হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্য তাহা কেন করিবে না? সিক্ত মৃত্তিকাতে যে ছাপ লাগান যায়, তাহা শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে চিরদিন রহিয়া যায়। অশিক্ষিত গৃহিণীরা যন্ত্রণা এবং দুর্ব্যবহার দ্বারা বালিকার কোমল হৃদয়ে যে ছাপ বসাইয়া দেন, তাহা তাহাদের জীবনের চিরসহচর হইয়া যায়। সুতরাং তাহারাই আবার যখন শ্বশ্রুরূপে দণ্ডায়মান হয়, তখন শ্বশ্রুর নিকট যে ব্যবহার শিখিয়াছে তাহা বধূদিগের প্রতি করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, জননী ধৈর্য্যশালিনী ও মমতাময়ী হইলেও তাঁহার কন্যা বয়ঃস্থা হইলে কর্কশভাষিণী ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। তাহারও একমাত্র কারণ এই যে, নীচতার ভিতর থাকিয়া এবং সর্ব্বদা নানারূপ যন্ত্রণা ও অশান্তি ভোগ করিয়া তাহার স্বভাব বড়ই অধীর হইয়া পড়ে। হিন্দুগৃহে দ্বাদশ বৎসরে বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণরূপ হইয়া উঠে না। যে বয়সে পুতুলখেলার সময়, সেই বয়সেই তাহাদের বিষম পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। তাহাতে তাহারা সুশিক্ষার অভাবে কুশিক্ষাই পাইয়া থাকে। সে স্থলে কিরূপে ভবিষ্যতে এবং বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির উন্নতির আশা করা যায়? আর তাহার আশাই বা কোথায়?

যে হিন্দুধর্ম্ম প্রভাবে চৈতন্যদেব আপামর সাধারণকে প্রেম বিলাইয়াছিলেন, সেই হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, ভগিনীগণ! আপনারা কোন্ প্রাণে স্নেহের পুত্তলি আদরের ধন পুত্রবধূদিগকে স্নেহের পরিবর্ত্তে কষ্ট এবং যন্ত্রণা দিয়া থাকেন? যে জাতি নিজ পরিবারের ভিতর স্নেহ, প্রেম দিতে অপারক, বিশ্বপ্রেম সে জাতি কোথা হইতে শিখিবে? সে জাতির উন্নতির আশা ও দুরাশা মাত্র। জগদীশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, আমার হিন্দু ভ্রাতৃগণ যেন গৃহের রমণীগণের শিক্ষা বিধানে সচেষ্ট এবং যত্নবান্ হইয়া ভগবৎকৃপায় হৃদয়ে শক্তি এবং উৎসাহ লাভ করেন। তাহা হইলে প্রতি হিন্দুগৃহ শান্তি ও সুখের আলয় হইয়া উঠিবে। ইতি

শ্রীমতী অ—সান্যাল।

চারিত্রিক ইতিকথা।*

অধুনা কবিবর মাইকেলের গ্রন্থাবলী সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে স্থান পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সেজন্য বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্যের সেবক ও পাঠক সকলেই ঋণী। বর্ত্তমান সংস্করণের পূর্ব্বে মাইকেল গ্রন্থাবলীর আর এক সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছিল। উহাতে "কুসুম কলিকা"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঘোষ মহাশয়ের লিখিত মাইকেলের কাব্যগ্রন্থের একটি সমালোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। "বসুমতী" পুস্তক-বিভাগ হইতে মাইকেলের যে কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, উহার মধ্যেও সেই সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। সমালোচনাটী এক সময়ে বড় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। আজ পর্য্যন্ত সেরূপ পক্ষপাতশূন্য ও খাঁটি সমালোচনা খুব কম পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। এই "কুসুম কলিকা"-প্রণেতা প্রসন্ন বাবু কে, তাহার অনুসন্ধান করিতে বিরত হই নাই। কিন্তু "কুসুম কলিকা" কিম্বা তাহার রচয়িতা এতদুভয়ের কাহারও কোন সংবাদ কখনও পাইব এমন আশা ছিল না।

হঠাৎ কর্ম্মোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমায় যাইতে হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভূষণ বঙ্কিমচন্দ্র এক সময়ে কাঁথিতে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার কোন কোন গ্রন্থের কোন কোন অংশবিশেষ রচিত হইয়াছিল, এ কথাও শুনিয়াছিলাম। কাঁথিতে গিয়া অবধি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু সংবাদ রাখেন, এমন লোকের সন্ধান করিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়।

প্রসন্নকুমার বাবু বয়সে প্রাচীন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতাতেই 'লণ্ডন মিশনরি কলেজে' এফ্, এ পড়েন। সেই সময়ে কবিবর হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রসন্ন বাবুর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু শুনিব আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কবিবর হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম।

হেমচন্দ্রের সহিত পরিচয়ের কিছুদিন পরে (সে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা) প্রসন্ন বাবু তাঁহার দুই পুত্রের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত হন। এই সূত্রে হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। প্রসন্ন বাবু বৃদ্ধ বয়সে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার মধ্যেও হেমচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও এমন সুন্দররূপে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যিনি তাহা শুনিতেন,

---

* "ইতি কথা" শব্দটী ইংরাজী anecdote শব্দের সহিত একার্থবোধক। প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় "ইতি কথা" শব্দ প্রচলন করিয়াছেন। লেখক।

তাঁহাকেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হইত। প্রসন্ন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া অনেক দিন রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যান্ত একাসনে বসিয়া তাঁহার নিকট অবিচ্ছিন্নভাবে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়াছি। আমার মনে হয় হেমচন্দ্রের প্রতিভা ও প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের সম্মান অমন করিয়া আর কেহ করিতে পারে নাই। সন্ধ্যার ম্লান প্রদীপালোকে বসিয়া কত সময়ে দেখিয়াছি যে, সেই নির্জ্জন গৃহে হেমচন্দ্রের কথা বলিতে বলিতে শ্বেতশ্মশ্রু প্রসন্নকুমারের বার্দ্ধক্যসুলভ অবসাদ ও জড়তার ভাব তিরোহিত হইত ও তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব উৎসাহ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইত।

মাইকেলের কাব্য-গ্রন্থাবলীর সমালোচনার ভার হেমচন্দ্রের উপর পড়িয়াছিল। হেমচন্দ্র সেই ভার প্রসন্নবাবুর উপর দেন। প্রসন্ন বাবুর বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তির উপর তাঁহার অসীম বিশ্বাস ছিল। বৃত্রসংহার কাব্য রচনাকালে প্রসন্নবাবু তাঁহার একজন প্রধান সহচর ছিলেন। প্রতিদিন যে অংশ রচিত হইত, সেটুকু সন্ধ্যার পর হেমচন্দ্র নিজে তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। অধিকাংশ সময় প্রসন্ন বাবু নীরবে শুনিয়া যাইতেন। হেমচন্দ্রের তাহা ভাল লাগিত না। তিনি সমালোচনা চাহিতেন। প্রসন্নকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সমালোচনার অতীত রাজ্যে বাস করিতেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের বারম্বার অনুরোধে তিনি অবশেষে সময়ে সময়ে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতেন। তখন হেমচন্দ্রের কবিযশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেরূপ অবস্থায় অপর কেহ হইলে নিজের কবিতা সম্বন্ধে লোকের মতামত জিজ্ঞাসা করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন মনে করিত, কিন্তু হেমচন্দ্রের সেরূপ দম্ভ সম্ভবপর ছিল না। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি অনেক সময়ে সন্দিহান হইতেন। নিজের বিচার বুদ্ধিকে সকল সময়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি নিজের মত, নিজের বিচার, বুদ্ধি ও নিজের কবিত্বশক্তিকে যতটুকু শ্রদ্ধা করিতেন, অপরের মত, বিচার, বুদ্ধি ও কবিত্বশক্তিকে ততোধিক শ্রদ্ধা করিতেন। ইহাতেই তাঁহাকে অনেক সময়ে নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান করিয়া তুলিত। বঙ্গের অন্যান্য আধুনিক কবি অপেক্ষা তিনি বিনয়মহত্বে যে অনেক উর্দ্ধ লোকে বাস করিতেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

অনেকেই জানেন হেমচন্দ্রের একটী প্রধান দোষ এই যে, তিনি সুরাপায়ী ছিলেন। কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধও তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া থাকেন। প্রসন্ন বাবু হেমচন্দ্রকে যেরূপ মহৎ হৃদয়ের লোক বলিয়া বর্ণনা করিতেন, তাহা শুনিলে কালিদাসের কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবাঙ্কঃ।"

অমিতব্যয়িতা এবং অতিরিক্ত দানশীলতার জন্যই যে কবিবর হেমচন্দ্র শেষজীবনে

জীবিকানির্ব্বাহের জন্য পরের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহা অনেকেই জানেন। প্রসন্নবাবুর নিকট শুনিয়াছি হেমচন্দ্র প্রতিভাশালী কবি না হইলেও, শুধু তাঁহার বিনয়, নম্র ব্যবহার ও দানশীলতার জন্যই আমাদের দেশের একজন স্মরণীয় ব্যক্তি হইয়া থাকিতেন। কত দীন ছাত্র, কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, কত অনাথা বিধবা তাঁহার আশ্রয় ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া জীবনে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোক দেখিতে পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে ?. হেমচন্দ্র দান করিবার সময় অর্থের হিসাব দেখিতেন না। ওকালতিতে তাঁহার যেমন অর্থাগম হইত তেমনি অজস্রধারে তিনি অর্থব্যয়ও করিতেন। তাঁহার আয় ব্যয়ের হিসাব ছিল বলিয়া মনে হয় না, কোন হিসাব থাকিলে নিশ্চয় দেখা যাইত যে, তাঁহার খরচের অঙ্কগুলি জমার তুলনায় নিতান্তই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রসন্ন বাবু মাইকেলের গ্রন্থাবলীর যে সমালোচনা করিয়াছেন, উহা গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত হইবার পূর্ব্বে হেমবাবুর হাতে গিয়াছিল। হেমচন্দ্র উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার উপর যে ভার ন্যস্ত হইয়াছিল, আমি সে গুরু ভার হইতে মুক্ত হইলাম। অধিকন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, আমা অপেক্ষা উপযুক্ত লোকের দ্বারা সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।"

কবিবর নবীনচন্দ্র এক সময়ে প্রকাশ্যে হেমচন্দ্রকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রও সে বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রসন্নবাবুর মুখে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রকে দেখিতে ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে উৎসুক হন। হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের পর নবীনন্দ্র তদীয় সুহৃৎ ও হেমচন্দ্রের অনুজ ঈশানচন্দ্রের নিকট বলিয়াছিলেন "এমন লোকের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া আমি বাস্তবিক গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিলাম।" নবীনচন্দ্র একদিন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন এ কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি হেমচন্দ্র সৌজন্য প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই।

হেমচন্দ্রের হৃদয় কত বড় ছিল তাহা একটী ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। যখন প্রসন্নবাবু তাঁহার পুত্রদের শিক্ষকপদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদিন অপমানসূচক ব্যবহার করায় হেমচন্দ্রের এক পুত্রকে (শুনিয়াছি এই পুত্রের দেহান্ত হইয়াছে) তিনি বেত্রাঘাত করেন। বালক সামান্য প্রহারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, তাহাতে হেমবাবু অন্য গৃহ হইতে প্রসন্নবাবুকে একখানি চিরকুট লিখিয়া পাঠান। চিরকুট পাঠ করিয়া প্রসন্নবাবু শাস্তি বন্ধ করিয়া বালককে হেমচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রোদনপরায়ণ বালক, শিক্ষক জব্দ হইয়াছেন মনে করিয়া পিতার নিকট গেল। হেমচন্দ্রের নিকট গিয়া বালক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যেই একটী

মাত্র কথা উচ্চারণ করিয়াছে, অমনি হেমচন্দ্র আসন ত্যাগ করিয়া পুত্রের গণ্ডদেশে একটী চপেটাঘাত করিলেন। প্রসন্নবাবু তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া অধিকতর শাস্তি হইতে বালকটীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র কুপিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "আপনি কোন কথা বলিবেন না, ও আজ আপনাকে অপমান করিয়াছে, কাল আমাকে করিবে।"

বালক যাহা ভাবিয়া পিতৃসন্নিধানে গিয়াছিল তাহার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিল। হেমচন্দ্র প্রসন্নবাবুকে বলিলেন "আপনি জানিবেন, আমাতে এবং আপনাতে কোন পার্থক্য নাই, আপনি আমার চাকর কিংবা অধীনস্থ ব্যক্তি নহেন। ভগবান্ আমার উপর এই পুত্রদের লালন পালন ও শিক্ষার ভার দিয়াছেন, কিন্তু বিষয়কর্ম্মে অনেকটা সময় দিতে হয় বলিয়া আমি নিজে উহাদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে পারি না। আপনি আমার পরম সুহৃৎ যে সেই কঠিন কর্ত্তব্যপালনে স্বেচ্ছায় আমার সহায়তা করিতেছেন। আপনার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধনীয়।"

যে দেশের ছাত্র ও ছাত্রের পিতা প্রাইভেট টিউটরকে ভদ্রবেশী ভৃত্য অপেক্ষা অধিক সম্মান করিতে জানেন না, সেই দেশে হেমচন্দ্রের মত লোকের জন্ম হইয়াছিল। প্রসন্নবাবু বলেন, "হেমচন্দ্রের মত জীবন্ত মানুষ খুব কম দেখিয়াছি।" হেমচন্দ্র যে জীবন্ত মানুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? জীবন্ত মানুষ না হইলে কি চক্ষু হারাইয়া, দারিদ্র্যের শিলাযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াও পরের দুঃখে ব্যথিত হইয়া লিখিতে পারিতেন—

"হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়,
নিজ পর ভাবি নাই অনন্ত উপায়,
যে এসেছে আশা করে দিয়েছি তাহায়,
এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়।
দুর্গত আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়,
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন,
হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন।"

চিত্তবিকাশ।

হেমচন্দ্র শুধু কবি ছিলেন না, তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান্ লোক বঙ্গদেশে বিরল। এই দু'য়ের সমাবেশে তিনি আধুনিক বঙ্গীয় কবিগণের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতের অনুলেপন দ্রব্য।

প্রাচীন আর্য্যগণ বিবিধ প্রকার গন্ধদ্রব্য ও বিবিধ প্রকার অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা গাত্র ভূষিত করিতেন। তাঁহারা গন্ধদ্রব্য সকল ভাল বাসিতেন বলিয়া

দেবপ্রীতি উদ্দেশে ঐ গুলি দেবতাদিগকে নিবেদন করিতেন। শাস্ত্রে পঞ্চোপচার, দশোপচার ও ষোড়শোপচার দ্বারা যে পূজার বিধান আছে, সেই কয়েকপ্রকার উপচারের মধ্যেই গন্ধ উপচারটী আছে। পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করা না হইলেও কেবল গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করা হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে আর্য্যদিগের প্রধান প্রীতিকর গন্ধ অনুলেপনটী দেবপূজার একটী প্রধান সামগ্রী ছিল।

প্রাচীন আর্য্যগণ স্নানের সময় উত্তমরূপে অঙ্গসংস্কার করিতেন। ঐ অঙ্গসংস্কারকে পরিকর্ম্ম বলা হইত। একটী কাজ করিয়া প্রয়োজন বশতঃ তাহার অনুকূলে অন্য কাজ করাকে পরিকর্ম্ম কহে। ইহাই পরিকর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। স্নানকালে পূর্ব্ব দিনের অনুলিপ্ত চন্দন বিলুপ্ত হইয়া যাইত, এই জন্য স্নানাদি করিয়াই তাঁহারা ঐ গুলির প্রবোধন বা অনুবোধ করিতেন, অর্থাৎ যে সকল চন্দনাদির গন্ধ থাকিত না, আবার যত্নপূর্ব্বক সেই সকল গন্ধের উদ্দীপন করিতেন। এই জন্য এরূপ অনুষ্ঠানকে পরিকর্ম্ম বলা যাইত। কর্পূর, অগুরু, কস্তুরি ও কক্কোল সমভাগে একত্র করিলে যে দ্রব্য হয়, তাহাকে যক্ষকর্দ্দম বলে। ঐ সকল অনুলেপন যক্ষদিগের প্রিয় ছিল বলিয়াই হয়ত গুণানুসারে উহার নাম যক্ষকর্দ্দম হইয়া থাকিবে। ঐ অনুলেপনটী তৎকালে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। অনেক গুলি গন্ধ দ্রব্যের চূর্ণকে বাসযোগ কহে। পূর্ব্বকালে কেহ কেহ যক্ষকর্দ্দমের পরিবর্ত্তে উক্তবিধ বাসযোগ ব্যবহার করিতেন। সেকালে শরীরে ধার্য্য গন্ধদ্রব্য ও অনুলেপনদ্রব্য নানা প্রকার ছিল। যথা শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, সিলারস, মৃগনাভি, জাতিফলচূর্ণ, তাম্রপর্ণী (মুড়ামাংসী), পুষ্করমূল, বেণার মূল ইত্যাদি।

ঐ সকলের মধ্যে কোন কোনটী স্নানের পর গাত্র সুগন্ধ করিবার জন্য, কোন কোনটী নিজের ও অন্যের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রীতি সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হইত। কোন কোনটী বা বিশেষ বিশেষ বিলাস বা বাবুগিরির জন্য মাখা হইত। কোন কোনটী শৈত্যনাশের জন্য, কোন কোনটী বা তাপনাশের জন্য, অঙ্গে লেপন করা হইত। কোন কোন গন্ধদ্রব্য দুর্লভ ও দুর্মূল্য বলিয়া সাধারণ লোকে তাহা প্রস্তুত করিয়া বা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে পারিত না। কি ভদ্র, কি ইতর, কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই চন্দন,বেণার মূল প্রভৃতি অনেকগুলি অনুলেপন দ্রব্য আদরপূর্ব্বক গাত্রে লেপন করিতেন। কিন্তু প্রত্যেক গন্ধদ্রব্য ও প্রত্যেক অনুলেপন দ্রব্যই যে ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অনুকূল ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে চন্দনের অনেকগুলি গুণ বর্ণিত আছে। উহা বমি, জ্বর, কৃমি, তৃষ্ণা ও সন্তাপ শান্তি করে এবং মুখ ও অন্যান্য স্থানের রোগনাশ

করে। গাত্রে চন্দন লেপন করিলে তাহার সৌগন্ধে মনে এক প্রকার অনুপম আনন্দ উপস্থিত হয়। উহাতে এরূপ এক বর্ণনাতীত স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া দেয় যে, তাহা অনভিপ্রায়োপস্থিত বিমর্ষভাবকে বহু দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। উহা যেমন বিষয়াভিলাষীর মনে রাগবিশেষ আনিয়া দেয়, তেমনি ঈশ্বরভক্তের হৃদয়েও ভগবৎপ্রেমের আবেশ জন্মাইয়া থাকে। তাহার কারণ সংক্ষেপে ইহাই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, মন প্রফুল্ল থাকিলে যিনি যে বিষয়ের অনুধ্যানেই নিবিষ্টপর থাকুন না, তিনি তাহাতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন। শ্বেত চন্দনের গাত্রসন্তাপ নাশ করিবার ক্ষমতা অনেকে উপলব্ধিও করিতে পারেন।

শ্বেত চন্দন যেরূপ তাপনাশ করে, তেমনি অগুরু চন্দন শৈত্যনাশ করে। দেবীপুরাণে লিখিত আছে ;—

"চন্দনোড়ুম্বর দাহনির্ব্বাপণলেপানাং,
রাস্নাগুরুণী শীতাপনয়প্রলেপানাং
লোমজ্জোকো শীতং দাহত্বগ্‌দোষ-
স্বেদাপনয়নপ্রলেপনানাং।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ দাহনাশক লেপন সকলের মধ্যে চন্দন ও উড়ুম্বর, শীতনাশক প্রলেপ সকলের মধ্যে রাস্না ও অগুরু, দাহনাশক, ত্বগ্‌দোষহারক ও স্বেদাপনয়ন প্রলেপনসমূহের মধ্যে বেণার মূল শ্রেষ্ঠ।

বেণার মূল যে অত্যন্ত তাপনাশক তাহা আমরা অনেক দিন হইতে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলাম। এক দিন অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় যখন শরীরের ঘর্ম্ম ও তাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন বেণার মূল বাটিয়া গায়ে মাখিয়া দেখিলাম অত্যল্প কালের মধ্যে সেই অসহ্য উত্তাপের আশ্চর্য্যরূপে শান্তি হইয়া গেল। তখন হইতে শাস্ত্রোক্ত অনুলেপন সকলের গুণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। পুষ্করমূলেরও ঐরূপ গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। শীতের সময় অগুরু বা কৃষ্ণ চন্দন গায়ে মাখিয়া দেখিয়াছি যে, উহাতে শরীরের শৈত্য অনেকটা নাশ করে। ঐ সকল লেপন দ্রব্য ব্যয়সাপেক্ষ নহে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে পুষ্করমূল, বেণার মূল প্রভৃতি দ্রব্য প্রায় সহজলভ্য। কোন কোন অনুলেপন দ্রব্য অল্প ব্যয়ে কিনিতে পারা যায়। সুতরাং সকলেই ইচ্ছা করিলে সহজলভ্য বা অল্পব্যয়লভ্য বিলেপন দ্রব্য সকল গায়ে মাখিয়া প্রীতি ও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

শিক্ষা।

জগৎপাতা জগদীশ্বর মানবকে কতকগুলি বৃত্তি দিয়াছেন। সেই বৃত্তিগুলির যথাযোগ্য চালনার নাম শিক্ষা। চালনা না হইলে কোনও বৃত্তিই সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না।

শিক্ষা দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। দৈহিক স্বাস্থ্য ও মনোবৃত্তির চরমোৎকর্ষই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুবিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি হীনচরিত্র বা স্বাস্থ্যহীন হইলে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই বলিতে হইবে

বাল্যকালই সকল প্রকার শিক্ষার উপযুক্ত সময়। এই সময় মন অতি তরল থাকে, সুতরাং উহাকে ইচ্ছামত গঠিত করিতে পারা যায়। মানবচরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। অভ্যাস একবার বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাহা পরিবর্ত্তন করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কৃষক যেমন বীজের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে ফলের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিতে পারে, সেইরূপ বাল্যে অভ্যস্ত সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা দেখিলে মানবচরিত্র উন্নত কিম্বা কলুষিত হইবে, বুঝিতে পারা যায়।

বাল্যে যে সুশিক্ষালাভ হয়, তাহা সময়ে কতদূর কার্য্যকরী হয়, তাহার উদাহরণের অভাব নাই। ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

শৈশবে মাতা আমাদের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী। কারণ জন্মগ্রহণের পর হইতেই অধিকাংশ সময় আমরা তাঁহারই নিকটে থাকি।

কেহ কেহ আবার স্বাবলম্বনপ্রভাবে বাল্যে সুশিক্ষা লাভ করেন। স্বর্গীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার উদাহরণস্থল। তিনি বাল্যে শিক্ষালাভের জন্য নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। অপরের বাসায় রন্ধনাদি কার্য্য করিয়াও নিজের পাঠ উত্তমরূপে অভ্যাস করিতেন। বাল্যের ঐকান্তিক চেষ্টা ও অবিচলিত অধ্যবসায় তাঁহার কার্য্যকারী জীবনের প্রধান সহায় হইয়াছিল।

আবার বাল্যকালের কুশিক্ষা সমস্ত জীবনে কিরূপ আধিপত্য লাভ করে, ইতিহাসে তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার মানবচরিত্রের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে। কথাটা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাই, কেহ একটা বিষয় অতি শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারে, আবার কেহবা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারে না। ধ্রুব পঞ্চমবর্ষীয় বালক হইয়াও ভগবানকে লাভ করিয়াছিল। আর বহু মুনি বহু ঋষি শত শত বৎসর তপস্যা করিয়াও তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হন নাই।

সে যাহাই হউক, বিশেষ যত্ন যে চরিত্রগঠনে সহায়তা করে, এ কথা কেহই অস্বীকার করেন না। আন্তরিক চেষ্টা করিলে প্রত্যেক লোকই ভাল হইতে পারেন। সকলেই মহৎ লোক হইতে না পারুন, কিন্তু বাল্যে সৎশিক্ষা লাভ করিলে যে জীবনের মহত্ত্ব বৃদ্ধি হয়, এ কথা সকলেরই অনুমোদিত।

শারীরিক শিক্ষালাভ করিতে হইলে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হয়। দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ ও মাদক দ্রব্য সেবন সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। অঙ্গচালনার প্রতি সকলের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের দেহটী একটী যন্ত্রবিশেষ। যে কোনও অংশ চালনার অভাবে বিকল হইতে পারে। অতএব সকলেরই ব্যায়াম অভ্যাস করা আবশ্যক। কিন্তু অত্যধিক কিছুই ভাল নয়। ব্যায়াম না করা যেরূপ দূষণীয়, অত্যধিক ব্যায়ামও তদ্রূপ অনিষ্টকর। ইহাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে।

বাল্যকাল হইতে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি যদি সম্যক্ পরিমার্জ্জিত না হয়, তবে পশু ও মানবে অধিক প্রভেদ থাকে না। পুস্তক-পাঠ, সৎ-আদর্শানুসরণ প্রভৃতি এই শিক্ষার উপায়।

নৈতিক শিক্ষা (Moral and Religious training), ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা না হইলে কোন শিক্ষাই ফলদায়ক হয় না। চরিত্রবল অনেকটা ধর্ম্মবলের উপর নির্ভর করে। মানব বিদ্বান্ ও ক্ষমতাশালী হইয়া যদি চরিত্রহীন বা নৈতিকবলহীন হয়, তাহা হইলে তাহার সকল শিক্ষাই ভস্মে পরিণত হয় এবং তাহাকে উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

নেপোলিয়ন যুদ্ধের সময়েও বলিতেন—"Moral is to physical as ten to one" অর্থাৎ শারীরিক শক্তি অপেক্ষা নৈতিক বল দশগুণ প্রয়োজনীয়। নৈতিক বলের প্রয়োজনীয়তা অধিক বলিয়া কেহ যেন শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়ে উপেক্ষা না করেন। কারণ মন ও শরীরের অতি নিকট সম্বন্ধ, একটীকে অন্যটী হইতে পৃথক্ করা যায় না। যদি শরীর অসুস্থ থাকে, মানসিক তেজও নিস্তেজ হইয়া যায়।

মানসিক বলের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র অনুভূত হয়। মানব মানসিক তেজোবলে দৈবকেও প্রতিহত করিতে পারে। সাবিত্রী—সত্যবানকে, বেহুলা—তাহার স্বামীকে, মানসিক তেজোবলে মৃতাবস্থা হইতে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।

মোগল সম্রাট্ বাবর, মানসিক তেজোবলে স্বীয় পুত্র হুমায়ুনের ব্যাধি নিজ দেহে সংক্রামিত করিয়া পুত্রবাৎসল্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহার আরও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যুক্তিই সমীচীন। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, আজকাল লোক ইচ্ছাশক্তিবলে মৃত ব্যক্তির আত্মা আনয়ন

করিয়া ইহপরলোকের সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছে, দেখিতে পাইতেছি। অভ্যাস এবং ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মানসিক তেজ বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়।

নিম্নলিখিত উপায়গুলি ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত। এগুলি পালন করিলে শরীর ও মনের উন্নতির অনেক সহায়তা হইতে পারে :—

১। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, অর্থাৎ ৪ দণ্ড রাত্রি থাকিতে অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি বা নিদ্রা থাকা সত্ত্বেও শয্যাত্যাগ।

২। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কিয়ৎক্ষণ নিম্নলিখিত প্রকারে চিন্তা করা—"আমি পরমাত্মার অংশ। আমি এই দেহ নয়। এই ঘর, বাড়ী, ধন, জন প্রভৃতিও আমার নয়। আমি কতকগুলি কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি। আমাকে কোনও প্রলোভনে টলাইতে পারে না।"

৩। যে সময়ের যে কাজ, সেই সময়ে তাহা করা।

৪। যখন যে কার্য্য করিবে, সেই কার্য্য একমনে করা ও অন্য দিকে মন না দেওয়া।

৫। সর্ব্বদা একটা আয়োজনের ভাব পোষণ করা, অর্থাৎ অলস হইয়া বসিয়া না থাকা। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে নানাপ্রকার কুচিন্তা আসিতে পারে।

৬। প্রত্যহ অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ ভগবৎ-উপাসনা ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা।

৭। ন্যায়বিগর্হিত কোন কার্য্য না করা।

বাল্যকালই উপরি-উক্ত উপায়গুলি অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সময়।

শিক্ষার শেষ নাই। কেহ বলিতে পারেন না যে, তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। যিনি তাহা বলেন, তিনি অহঙ্কারী। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি বিনয়ী। তাহার জ্ঞান-লিপ্সা অত্যন্ত প্রবল। অসীম ধীশক্তিশালী নিউটন (Newton) বলিয়াছিলেন—"আমি বহু চেষ্টায় জ্ঞানসমুদ্রের একটী বালুকাকণামাত্র সঞ্চয় করিয়াছি।" যাহার শিক্ষার সম্পূর্ণতা লাভ হইয়াছে, তিনি মনুষ্য নন, দেবতা। দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণাবলী একাধারে তাঁহাতে বিদ্যমান।

ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৯৯ জন লোক অশিক্ষিত। কারণ পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষালাভের বিশেষ সুবিধা এদেশে নাই।

পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষার উৎকর্ষে শিল্প-বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে। আর ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাবে লোকে গৃহবিবাদ, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাব, এবং শিল্পবাণিজ্যের অবনতির নিমিত্ত অশেষ ক্লেশ পাইতেছে।

শিক্ষার অভাবে বা কুশিক্ষার বালিকাদের কোমল অন্তঃকরণ হইতে ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

যে ভারতবর্ষ এককালে শিক্ষা দীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, যে ভারতবাসীর সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাব চিরপ্রসিদ্ধ, তাহাদের বংশধরেরা আজ শিক্ষার অভাবে চরিত্রহীন হইয়া ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর

হইতেছে। কালের কি অপার মহিমা! আশ্রমচতুষ্টয়ের ব্যবস্থা যে কি সুন্দর ছিল, যিনি ধীরচিত্তে দেখিবেন তিনিই তাহার মহত্ত্ব স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বকালে লোকে ৩০।৩৫ বৎসর অবধি গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পাঠাভ্যাস করিত। তাহার পর বিবাহাদি করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবার উপযুক্ত হইত। সর্ব্বশেষে অপর দুই আশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করিত। আর আজকাল যুবকবৃন্দ স্বেচ্ছাচারী হইয়া দিন দিন ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে। দেশের দরিদ্রতার ইহাও একটী অন্যতম কারণ।

শ্রীকৃষ্ণধন বসু।

নূতন সংবাদ।

১। সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলে প্রত্যেক বৎসর প্রায় (৮০০০০০০০ × ২৮) বা ২২৪০০০০০০০ (বাইশ কোটী চল্লিশ লক্ষ) মণ কাগজ ব্যবহৃত হয়।

২। সম্প্রতি বংশের (বাঁশের) কাগজ প্রস্তুতকরণপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রিয়ার্ট নামক এক ইংরাজ দশ বৎসরের পরীক্ষার ফলে এই প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। বংশগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা মণ্ডে পরিণত করিয়া তৎপরে তাহা হইতে অতি উত্তম, স্থায়ী ও ব্যবহারোপযোগী কাগজ প্রস্তুত করা হয়। এই কাগজে লেখা ও ছাপা অতি সুন্দর হয়।

৩। আমেরিকায় এক প্রকার নূতন অস্ত্র-চিকিৎসা হইয়া গিয়াছে। কোনও রোগীর নাসিকা পচিয়া গিয়াছিল। চিকিৎসক মহাশয় এক ব্যক্তির পায়ের হাড় লইয়া এক কৃত্রিম নাসিকা প্রস্তুত করেন, এবং ঐ রোগীর বাহুর লোমশূন্য স্থানে উহা বসাইয়া দেন। কয়েক মাস অতীত হইলে, সেই কৃত্রিম নাসিকার উপর মাংস জন্মে। অতঃপর চিকিৎসক মহাশয় উক্ত স্থান হইতে নাসিকাটী কাটিয়া লইয়া যথাস্থানে সংস্থাপিত করেন। এক্ষণে সেই নাসিকাটী আর কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় না।

৪। ভারতহিতৈষী ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রিপনের প্রস্তর মূর্ত্তি ইংলণ্ডে নির্ম্মিত হইতেছে। ইহা এই বৎসরের মধ্যেই গড়ের মাঠে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৫। পুত্রের পীড়াবশতঃ স্যর্ এড্‌ওয়ার্ড বেকার তাঁহার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে এক্ষণে মাননীয় ডিউক সাহেব তাঁহার স্থানে কার্য্য করিতেছেন।

৬। স্পেন দেশে ক্যাপিকোরিয়া প্রদেশের সোনামানামক নগরের গৃহগুলি সব কাষ্ঠনির্ম্মিত। তথায় অগ্নি লাগিয়া সহর পুড়িতে আরম্ভ করিলে, জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু

জলাভাব হওয়ায় নগরবাসিগণ মদের ডিপো হইতে মদ লইয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। ইহাতে ২৪০০০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

৭। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সামারসেট সায়ারের গ্লাষ্টনবেরী নগর হইতে গুরে প্রদেশের কিংষ্টন নগর পর্য্যন্ত একজন একটী বিড়ালকে লইয়া যান। কিংষ্টনে পৌছিয়া তিনি বিড়ালটীকে আর দেখিতে পান নাই। কিছুদিন পরে তাঁহার নিকট পত্র আসে যে, বিড়ালটী গ্লাষ্টনবেরী নগরে ফিরিয়া গিয়াছে। কিংষ্টন নগর গ্লাষ্টনরেবী নগর হইতে ১৩৩ একশত তেত্রিশ মাইল দূর। বিড়ালের অদ্ভুত শক্তি!

৮। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ২৪ পরগণার বরিশা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার অত্যন্ত পারদর্শিতা ছিল। গোয়ালিয়র, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদে তিনি সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। বঙ্গদেশে ও যুক্তপ্রদেশে বহুসংখ্যক লোক তাঁহার সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

৯। শুনা যাইতেছে, দিল্লীর দরবারে বাদসাহী মেলা বসিবে। সাধারণ লোকে এই মেলায় আনন্দ উপভোগ করিবেন। ঝিন্দের রাজা উক্ত মেলায় ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিবেন।

১০। উদারচেতা বরোদারাজ গাইকাড় যথার্থই প্রজাগণের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি দেখিতে ইচ্ছুক এবং তজ্জন্যই তিনি প্রজাহিতকর নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বীয় রাজ্য আদর্শরাজ্যে পরিণত করিতেছেন। প্রজাগণ যদি সকলেই শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে দেশের উন্নতি অনিবার্য্য, এই জন্যই তিনি স্বরাজ্যে প্রজাদিগের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার করিতে অত্যন্ত প্রয়াস পাইতেছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার রাজ্যে আরও অধিক বিস্তৃতভাবে লোকের জ্ঞানানুরাগবর্দ্ধনের জন্য “Free Reading-room” বা বিনামূল্যে সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এখানে তাঁহার প্রজাগণ বিনাব্যয়ে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানোন্নতি করিতে পারিবে। গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে এইরূপ এক একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রায় এক মাস হইল গাইকাড় এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই বরোদা রাজ্যে ২৪১ দুই শত একচল্লিশটীর উপর পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। বরোদাধিপতি আদর্শস্থানীয়। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

“ঘরের কথা”—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। এই পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহাতে কয়েকটী বঙ্গীয় পারিবারিক চিত্র সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে লেখার মৌলিকত্বও আছে।

“সরোজিনীর শুচিবাই” প্রভৃতি কয়েকটী গল্প অতি সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গীয় হিন্দু পরিবারের মধ্যে অনেক স্থানে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকদিগের শুচিবাই বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে বিষময় ও শোচনীয় ফল উৎপাদন করে। আমরা আশা করি, আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীরা এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করেন। গ্রন্থকার একজন প্রবীণ লেখক, ইনি বঙ্গসাহিত্য জগতে অপরিচিত নহেন।

বামারচনা।

চাঁদের প্রতি কুমুদিনী।

ওগো—ত্রিদিবের শশধর!
চাহি তব মুখ পানে।
সারা নিশি মগ্ন রই
তোমারি মহিমা ধ্যানে।

তুমি—প্রভাতে ফেলিয়া যাও—
বিষাদ আঁধারে রাখি।
নয়ন মুদিয়ে শুধু
তোমারে হৃদয়ে দেখি।

আমি—দেখিতে তোমার ওই,
ভুবনমোহন হাসি,
আপনা ভুলিয়ে সখে!
জেগে থাকি সারা নিশি।

ওগো—মলিন ধরায় আমি,
স্বরগে তোমার স্থান।
আদরে লবে কি দেব!
মোর এই ক্ষুদ্র প্রাণ?

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

নিবেদন।

(১)

তোমার এ প্রেম রাজ্যে আমি অভাজন,
নাহি জানি পূজা ধর্ম্ম,
না জানি করিতে কর্ম্ম,
কেবল স্বার্থের মাঝে আছি নিমগন।
পাপে তাপে জর্জ্জরিত,
সদাই আমার চিত,

শুধু "দাও", "দাও" শব্দ অন্তরে আমার,
মেটে না আকাঙ্ক্ষা আশা,
প্রাণ ভরা শুধু তৃষা,
বাসনা জাগিয়া হৃদে উঠে অনিবার।

(২)

কিনা তুমি দিয়াছ গো এ অধম জনে?
দেছ প্রাণ, দেছ হিয়া,
মরমে মমতা দিয়া
গঠিয়াছ আমারেত তুমি সযতনে।
কিন্তু নাথ! কেন বল,
অন্তর না তৃপ্ত হ'ল,
এ দুরাশা কেন হরি! দিলে গো আমায়?
দাও নাই রত্ন ধন,
তাহাতে কি প্রয়োজন?
ধনেই কি মানবের সব জ্বালা যায়?
অতৃপ্ত বাসনা হেন,
আমারে গো দিলে কেন?
দয়া কর দয়াময় অভাগা অধমে
দাও প্রীতি ভালবাসা,
মুছে দাও এ দুরাশা
শান্তির প্রবাহ সদা ঢাল এ মরমে।

(৩)

আমারে যা দেছ নাথ! দিব তা তোমায়
ভক্তি পুষ্প উপহার,
সহ প্রেম অশ্রুধার,
আমার পরাণ মন নিবেদি ও-পায়।
যাহা মোরে দাও নাই,
দাও মোরে চাহি তাই,
দাও শান্তি তৃপ্তি প্রীতি মোরে ভগবন্!
কাতর না হই দুঃখে,
ব্যথা সহি হাসিমুখে,
দাও সেই শক্তি মোরে হৃদয়রঞ্জন!
দিবা নিশি অবিরাম,
এ হৃদয়ে প্রাণারাম!
পাই যেন হেরিবারে ও-পূত চরণ।
না ভুলি আপন ধর্ম্ম,
তোমার চরণে মতি থাক্ অনুক্ষণ।
সংসারের তাড়নায়,
যেন না ভুলি তোমায়,
দয়াময়! অভাগীর এই নিবেদন।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

পিতা।

সারা জীবনের পথে
থাক তুমি সাথে সাথে,
তবু কেন প্রলোভন আসি,
হৃদয়ের দৃঢ় বাঁধ
শিথিল অবশ করে,
কেন ফেলে এ জীবন গ্রাসি?

কত প্রতিজ্ঞার ডোরে
বেঁধে রাখি আপনারে,
সংযমের সুদৃঢ় বাঁধন,
একটী নিমেষে হায় হায়!
কোথায় পলায়ে যায়,
জীবনের কঠিন সাধন।

বসে বসে আনমনে
ভাবিতাম সংগোপনে,
অপূত বাসনা, পাপ কাজ,
কোন দূষা চিন্তারাশি,
ম্লান করিবেনা আসি,
আসিবেনা হৃদিমাঝে কোন রূপ লাজ।

ফুল্ল কুসুমের মত
লয়ে সুবাসনা শত
আমি রব ত্তয়ারে তোমার,
আদেশ বহিয়া শিরে
বেড়াইব বিশ্বে ফিরে
তব কাজে, দেবতা আমার।

এরূপে আপনা ধ্যানে
তৃপ্তি পাই সংগোপনে
আপনারি আরাধনা করি।
তাই প্রভু বারে বারে
পরীক্ষায় ফেলে মোরে
আমার সে ধ্যান ভাঙ্গ হরি।

অতি তুচ্ছ প্রলোভনে
ভেঙ্গে চুরে কোন্ খানে
পড়ে যাই, কোন্ অন্ধকূপে,
হৃদয় আকুল পারা
আঁখি হতে তপ্ত ধারা
দাঁড়াতে পারি না কোন রূপে।

আমার সংযমশিক্ষা
আমার আমাতে দীক্ষা
আমি-ময় জগত আমার,
বাঁচাতে পারে না মোরে
হাতখানি রাখ ধরে
তুমি প্রাণনাথ বাঁচাও এবার।

তুমি এস অন্তঃপুরে
তুমি থাক বিশ্বভরে,
লহ তুমি জীবনের ভার।
দেবতা আমার।

সরলা দত্ত।

দীপ্ত আঁধার।

বহু বর্ষ কাটায়েছি লয়ে শুধু আপনারে,
মিথ্যা সুখ মিথ্যা দুঃখে করেছি যাপন
হে জননি! শুধু মিথ্যা স্বার্থ অন্ধকারে
ধাতার অমূল্য দান মানবজীবন।
অশ্রান্ত দুরাশা শুধু অবশ অন্তরে
অবিরাম নিষ্ফলতা আনিয়াছে ভরে।
কণ্টকবিকীর্ণ পথে কত দিন ধরি'
অসাড়, আবিলাভরা জীবন বহিয়া
বিপথে চলেছি, শত বেদনায় কর
ভারাক্রান্ত প্রাণ, শত হীনতা সহিয়া।
হে অভয়ে, জ্যোতির্ম্ময়ি! কোন্ পুণ্যফলে
বিশ্বজননীর বেশে তুমি দেখা দিলে?
তোমার প্রদীপ্ত আলো অন্ধ আঁখি মোর
অপূর্ব্ব আনন্দালোকে দিল ফুটাইয়া।
অসীম করুণা তব পলকে কেমনে,
কোন্ সে অজ্ঞাত স্বর্গে নিল উঠাইয়া
মৃত্যু ভারাক্রান্ত চির-অচেতন প্রাণ,
জাগায়ে তুলিলে করি কি অমৃত দান।

"আমি"র দুশ্ছেদ্য পাশ ছিঁড়ি অনায়াসে
জাগিব কি নব বলে হয়ে বলীয়ান্?
তোমার মহিমাগীতি ধ্বনিয়া আকাশে
গাহিয়া উঠিছে যেন সকল পরাণ।
ইহলোক, পরলোক, জীবন মরণ,
ব্যাপিয়া দেখিতে পাই অভয় চরণ।

কুটীরে।

জননী আমার শক্তিরূপিণি!
এস মা! কুটীরে আজি,
ভক্তি পুলকে উঠিবে ফুটিয়া
সুরভি কুসুমরাজি।

পুষ্পিত মম হৃদি কুটীরে,
বাজিবে মোহন বাঁশী।
প্রীতি সাধনার অশ্রু শিশিরে
সেফালি ঝরিবে হাসি।

নিভন্ত মম দীপটী প্রাণের
জ্বলিয়া উঠিবে পুনঃ,
অঞ্জলি হ'য়ে ঝরিবে চরণে,
মরমের প্রেম চন্দন।

পূজা অবশেষে যেন মা! তোমার
স্নেহের আশীষ ধরি,
জীবনের ব্রত সাধিবারে পাই
তোমারি করুণা স্মরি।

তোমার মোহন অঞ্চলে মাগো!
প্রেম পুলক কিরণে
আবরি রেখ মা! সন্তানে তব,
নিত্য কল্যাণ সাধনে!

শ্রীমতীপ্রিয়বালা রায়।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 581. January, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

৪৯ বর্ষ। ৫৮১ সংখ্যা। পৌষ, ১৩১৮। ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—অযোধ্যার খাজুরগাঁওএর রাজা রাণা সার শিওরাজ সিং, কে, সি, এস, আই, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক লক্ষ পঁচিশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই দান অতীব প্রশংসনীয়।

মৃত্যু—মহীশূর (Mysore) রাজ্যের দেওয়ান স্যার কৃষ্ণমূর্ত্তি পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। শাসনকার্য্যে ইনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

মাদক বিষয়ক প্রশ্ন—শুনা যায়, বিলাতে পার্লামেণ্ট সভার গত অধিবেশনকালে অন্যতম মাননীয় সদস্য সার জন্ রবার্টস্ না কি ভারতে মাদক দ্রব্যের অতিশয় প্রচলন ও তৎপ্রতিকারমূলক কতিপয় প্রশ্ন করেন। ইহার উত্তরে সহকারী ভারত সচিব মণ্টেগ্ বাহাদুর না কি বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ ইহার সংস্কারে উদ্যোগী হইয়াছেন। ছোট লাট ও গবর্ণর এ সম্বন্ধে যিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, সেইরূপ করিবেন। এ বিষয়ে ভারত সচিব কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। জনসাধারণের হিতকল্পে যাহাতে মাদক দ্রব্যসমূহ অনায়াসলভ্য না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রীলোকের কাজ।

কোন হিন্দু মহিলা যদি বাল্যকালে বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিখেন, তাহা হইলে ত 'সোনায় সোহাগা' হইবে। উহাদ্বারা তাঁহার শিক্ষাশক্তি ও উপার্জ্জন অপেক্ষাকৃত অধিক হইবারই সম্ভাবনা।

আজ কাল আমাদের দেশের সহর, মফস্বল, সর্ব্বত্রই স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক দেখা যায়। কলিকাতার কলেজে পড়া নব্য যুবকেরা নিজ নিজ স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীদিগকে শিক্ষিতা দেখিতে যেমন ব্যগ্র, পল্লীগ্রামের জমিদার বাবুরাও তাহাদের কন্যা, বধূ প্রভৃতিকে লেখা পড়া শিখাইতে তেমনি উৎসুক। সেই জন্য হিন্দু মহিলা শিক্ষয়িত্রী হওয়ার উপযুক্ত বিদ্যাবতী ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত হইলে তাঁহাদের কার্য্যের অভাব থাকিবে না। অবশ্য পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরে কাজের বেশী সচ্ছলতা, আর উপার্জ্জনও অধিক।

কলিকাতায় কোন গৃহস্থের কন্যা ও বধূকে এক সঙ্গে সপ্তাহে দু ঘণ্টা পড়াইলে, মাহিনা মাসে ২৲ দুই টাকা, ছয় ঘণ্টা ৪৲ চারি টাকা, বার ঘণ্টা ৮৲ আট টাকা। তিন চারি জন একত্র পড়িলে দুই ঘণ্টা ৩৲ তিন টাকা, চারি ঘণ্টা ৫৲ পাঁচ টাকা এবং আট ঘণ্টা ১০৲ দশ টাকা। অবশ্য, লেখাপড়ার সঙ্গে সেলাই, বোনা ইত্যাদি শিখাইলে মাহিনা কিছু বেশী হয়। একজন শিক্ষয়িত্রী রোজ স্বচ্ছন্দে তিনটী পরিবারে ছয় ঘণ্টা শিক্ষা দিতে পারেন। আর তাঁহার যদি ঘর আষ্টেক ছাত্রী থাকে ও সপ্তাহে গড়ে ত্রিশ ঘণ্টা খাটিতে হয়, তাহা হইলে তিনি মাসে ৪০৲ চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। উহা হইতে পাল্কী-খরচ ১০৲ দশ টাকা বাদ দিলেও তাঁর আসল আয় ৩০৲ টাকা রহিল। বর্ত্তমান হিন্দু মহিলাদিগের পক্ষে মাসে ২০৲।২৫৲ টাকা উপার্জ্জনই যথেষ্ট বোধ হইবে। কিন্তু শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ছাত্রীদের বয়স ও বিদ্যা বুঝিয়া নিজ জ্ঞান ও বিদ্যার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

যদি তুমি উহাতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে ঐ গুরু কার্য্যের দায়িত্ব লইও না। কিছু দিনের পর উহাতে অক্ষম বলিয়া লজ্জিত ও কার্য্যচ্যুত হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রথম হইতেই নিজ সাধ্যাতীত কাজে না যাওয়া বুদ্ধিমতীর কাজ। বিশেষ, দুএকটী পরিবারে প্রথমে মনের মত শিক্ষা দিতে পারিলে তাঁহাদের অনুরোধে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কাজ পাইবারও অনেক সম্ভাবনা আছে।

স্ত্রীলোকেরা উত্তমরূপে শিক্ষিতা হইলে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রীর কাজ ব্যতীত বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যেও তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারেন। অবশ্য উহার জন্য প্রথমে পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক শিক্ষা ও পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু ইহা সকলের মনে রাখা উচিত যে বিনা জ্ঞান-

লাভ ও পরিশ্রমে এ জগতে কোন ভাল কাজই সাধন করিবার শক্তি হয় না। সুতরাং কেবল অতি বিদ্যাবতী, জ্ঞানবতী ও শ্রমরতা নারীরাই উচ্চ শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত। আমাদের আরও মনে রাখা উচিত যে, ইচ্ছা ও সুবিধা থাকিলে প্রত্যেক স্ত্রীলোকই বিদ্যাবতী ও জ্ঞানবতী হইতে পারেন। আমরা বাল্যকাল হইতে নিজেকে যে ভাবে প্রস্তুত করি, বয়সকালে সেইরূপই হই। শৈশবে ও বাল্যে যদি আমরা একাগ্রচিত্তে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জ্জনে অভ্যস্ত হই, তাহা হইলে পরিণত বয়সে আমরা নিশ্চয়ই জ্ঞানবতী, সুশিক্ষিতা নারী হইব। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের বাল্যজীবন যদি কেবল পুতুলখেলা ও নানারূপ কুসংস্কারের মধ্যে অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে যৌবনে আমরা এক এক জন অলস, নিদ্রাপ্রিয় ও অজ্ঞ স্ত্রীলোক হইয়া উঠিব।

স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। উহার জন্য জ্ঞান ও বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বলেরও একান্ত আবশ্যক। অনেক সময় উহাতে এত খাটিতে হয় ও বকিয়া বকিয়া এত বিরক্তি ধরে যে, এইরূপে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা উপার্জ্জন অতি কষ্টকর হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, উহাতে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা ও ধৈর্য্যের আবশ্যক। কিন্তু একদিক দিয়া দেখিলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ যেমন অতিশয় বিরক্তিজনক, আমোদ-আহ্লাদ-শূন্য, এবং মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের বলনাশক বলিয়া বোধ হয়, অন্য দিক দিয়া দেখিলে উহা তেমনি একটী মহৎ কাজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা দ্বারা আমরা কি কাঁটাবন, কি মরুভূমি, কি কঙ্করময় প্রদেশ, সর্ব্বত্রই বীজ বপন করি।

তবে ঐ বীজ হইতে কখন কি প্রকার ফল ফলিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিশেষতঃ, অজ্ঞকে জ্ঞান ধর্ম্মের প্রভাব বুঝাইবার সুযোগ শিক্ষয়িত্রীর ন্যায় আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। শিক্ষয়িত্রী যদি যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত নিজের কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষা দ্বারা কত সুপ্রবৃত্তি উৎপাদিত ও চরিত্র উন্নত হইয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। উহার উপর তিনি নিজ জ্ঞানবলে ঐ জীবিকার উপায়কে যখন উচ্চ কর্ত্তব্য কাজ করিয়া তুলিতে পারিবেন, তখন ঐ সাধন তাঁহার স্বর্গের সোপান স্বরূপ হইয়া ক্রমে তাঁহাকে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করিবে।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমাদের ঋণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের আরও কয়েকটী উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজের কাছে আমরা বিশেষরূপে ঋণী। এখানে সংক্ষেপে সেই গুলির উল্লেখ করিব।

স্ত্রীশিক্ষা—ইহার স্বপক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, কার্য্যতঃ স্ত্রীজাতির প্রতি জনসাধারণের অধিক আদর ছিল না এবং এখনও নাই। স্ত্রীলোকদের যে লেখা পড়া শিখা আবশ্যক, এ কথা সকল শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিও স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয় না। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পক্ষে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, সকলেরই যতদূর সম্ভব দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিতান্ত আবশ্যক, ইহা যে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারি নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ব্রাহ্মসমাজই প্রথম অগ্রসর হন। সমাজ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের পথ অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও তাহা অনেকটা দূরে রহিয়াছে। বিশিষ্ট স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচারের এখনও অনেক বিলম্ব। যাহা কিছু হইতেছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মদের দেখাদেখি। দেশে যে কয়টী খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত সম্পর্কহীন উচ্চতর বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

অবরোধ-প্রথা—ইহা দেশের পল্লীগ্রামে কখনও পূর্ণ মাত্রায় ছিল না। সহর অঞ্চলেই উহার প্রচলন সচরাচর অধিক। আজ কাল উহার যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দেখা যায়, তাহার পথপ্রদর্শক ব্রাহ্মসমাজ। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় অনেক মর্য্যাদাপন্ন গৃহস্থের বাটীর মহিলাদের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ী চড়ার পদ্ধতি পর্য্যন্ত ভাল প্রচলিত ছিল না। এখন সেই সকল বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা গাড়ী চড়িয়া যাদুঘর, পশুশালা প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতেছেন, এবং সার্কস ও নাটমন্দিরেও যাইতেছেন। পুরীতে এখন তাহাদিগকে দলে দলে সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে দেখা যায়। মধুপুর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে রাস্তা ঘাট, পাহাড় ও পর্ব্বতে এখন পুরুষাপেক্ষা মহিলাদিগেরই বেশী সমাগম, এমন কি ইংরাজবহুল দার্জিলিংএর পাহাড়েও তাঁহারা নিতান্ত বিরল নহেন। অল্পে অল্পে সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে যে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার প্রতি অনেকের লক্ষ্য নাই। এই সব সামাজিক বিষয়ের প্রতি যাঁহারা একটু মনোযোগ দেন, তাঁহারা ৫০ বৎসর পরে অবরোধ-প্রথার কি অবস্থা দাঁড়াইবে, কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন। নীরবে এই যে পরিবর্ত্তন চলিতেছে ইহার মূলে ব্রাহ্মসমাজ।

বাল্যবিবাহ—সমাজের উচ্চতম স্তরে অতি অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ প্রথা অল্পে অল্পে কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কোন ভদ্রঘরে দশ বৎসরের বালিকা অবিবাহিত থাকিলে নানা দিক হইতে নিন্দাবাদ ধ্বনিত হইত। এখন যেখানে সহরের ঢেউ পৌঁছিতে অনেক সময় লাগে, এমন সুদূর পল্লী-গ্রামেও ১২।১৩ বৎসরের অবিবাহিত কন্যা নিতান্ত বিরল নহে। কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সব বংশ কুলমর্য্যাদার গৌরব করেন, তাঁহাদের মধ্যেও ১৩।১৪, এমন কি কখন কখন ১৫ বৎসরের অবিবাহিতা বালিকা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ হইবার নানা কারণ। তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন এখানে নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে কন্যা একটু বেশী বয়সে বিবাহিতা হইলে যে কিছুই ক্ষতি হয় না, এবং ইহা যে ঊর্দ্ধতন পুরুষদের নিরয়গমনের অন্যতম কারণ নহে, তাহা অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এখন বুঝিয়াছেন। আশা করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ক্রমে সমাজের নিম্ন স্তরে অনুসৃত হইবে। বালিকার বিবাহের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে বালকের বিবাহের বয়স বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ১৩।১৪ বৎসরের বালিকার সহিত ১৭।১৮ বৎসরের বালকের বিবাহ যে অসঙ্গত, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে অনেক যুবক ২০।২১ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে আর বিবাহ সুখ অনুভব করিতে পারেন না। এই যে আস্তে আস্তে পুত্র কন্যার বিবাহের বয়সবৃদ্ধি, ইহার জন্য আমরা কি কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের কাছে ঋণী নই? ব্রাহ্মসমাজ ইহার পথ দেখান এবং নানা কারণে হিন্দুসমাজ সেই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিধবা বিবাহ—ইহা যে হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে সমাজের কতক লোক ইহার প্রতি কিছু অনুকূল নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বা করিতেছেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহতী চেষ্টা যে কখনও ফলবতী হইবে না, ইহা জোর করিয়া আর বলা যায় না। বিধবা বিবাহ যে কোনরূপে অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ নহে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিশিষ্টরূপে হইয়াছে। বাহিরে স্বীকার করুন আর নাই করুন, যে সকল হিন্দু এখন ইহার প্রতিকূল নন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা ও কার্য্য দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্ররোচিত হন নাই, এ কথা কোন নিরপেক্ষ লোক বলিতে পারেন না।

বহুবিবাহ হ্রাস—ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুসমাজে ইহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। একেবারে ইহা আজও উঠিয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

ভিতর ইহা ঘৃণার চক্ষে লক্ষিত হইতেছে। বিবাহের প্রতি, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের প্রতি এখন আমরা নূতন ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়েও কতকটা আমাদের পথপ্রদর্শক। বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বহুবিবাহ ব্রাহ্ম সমাজের বিবাহের আইনবিরুদ্ধ।

সার্ব্বজনিক ভাব আমাদের মধ্যে অতি অল্পে অল্পে একটা সার্ব্বজনিক ভাব আসিয়া পড়িতেছে, এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। হিন্দু হউন বা মুসলমান কি খ্রীষ্টান হউন, ব্রাহ্মণ হউন বা নমঃশুদ্র হউন, আমরা সকলে বাঙ্গালী এবং সেই জন্য এক মাতার সন্তান, সকলেই ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ, এইরূপ ভাব দেশের কতকগুলি লোকের মনে উদয় হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প সন্দেহ নাই, কিন্তু আশা করা যায় যে, দেশবৎসলতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের দল ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে এই হতভাগ্য দেশের যে কখনও কোন উন্নতি হইবে এরূপ মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুসমাজ জাতিভেদ প্রথারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত। ইহাতে "বার রাজপুত তের হাঁড়ী।" রূপ দাঁড়াইয়াছে আমাদের মধ্যে পৃথক্ ভাব বড়ই প্রবল। একজন নিম্ন শ্রেণীর লোক একজন উচ্চ শ্রেণীর লোকের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিবে, ইহা অনেক উচ্চ শ্রেণীর লোক কল্পনাতেও আনিতে অক্ষম। বৌদ্ধ-যুগে এই পৃথক্ ভাবের, এই অনুদার ভাবের অপনয়নের চেষ্টা হয়। চৈতন্য দেব যখন তাঁহার প্রেমময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখনও এইরূপ চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ফল কতদূর হইয়াছে সকলেই জানেন। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই চেষ্টা আবার হইতেছে। দেশের কতকগুলি লোকের মনে এই সার্ব্বজনিক ভাবের উদয় হইয়াছে। এক মাতৃভূমির সন্তানদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জন্মান একান্ত আবশ্যক, নতুবা তাহাদের, উন্নতি অসম্ভব। এই ভাবের জন্য ইংরাজী শিক্ষার নিকট আমরা যে বিশেষরূপে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রাহ্মেরা যে ইহার বিস্তৃতির জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতেও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আজকাল সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে উত্তোলন করিবার কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে; যাহাতে তাহারা সমাজ হইতে চলিয়া না যায়, এরূপ ইচ্ছা অনেকের মনে উদয় হইতেছে। এই ইচ্ছা এবং এই চেষ্টার মূলে যে ব্রাহ্মসমাজ রহিয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। দেশের মধ্যে ভ্রাতৃভাববিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

বাঙ্গালা সাহিত্য—ইহা কি ব্রাহ্মসমাজের নিকট কোন বিষয়ে ঋণী নহে? অনেকে বলিবেন এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করা কেন? রাজা রামমোহন রায় প্রথমে বাঙ্গলা ব্যাকরন লিখিতে চেষ্টা করেন।

তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উচ্চ সাহিত্য দেশোন্নতির প্রধান সহায়। তিনিই বাঙ্গালা গদ্য লিখনপদ্ধতির প্রবর্ত্তক। তাঁহার গদ্যে ও আজকালকার গদ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু রাজা যখন গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল ইহা যদি একবার ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে তাঁহার পথে কিরূপ বাধা বিঘ্ন ছিল। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ছিল বলিয়াই তিনি সে সকল বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনের কিছুদিন পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের এক অক্ষয়কীর্ত্তি। বঙ্গের সাহিত্য জগতে উহা এক নবযুগ আনয়ন করে। উহার সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত কিরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা বর্ণনা করা এখানে অনাবশ্যক। যিনি বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তিনি উহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। তার পর কতক গুলি অতি উচ্চভাবপূর্ণ সুললিত বা গম্ভীর ধর্ম্মসঙ্গীত যে বঙ্গভাষা ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে পাইয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। উচ্চ অঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীতে দেশ প্লাবিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আর এক কথা—বাঙ্গালা ভাষায় যে সুন্দররূপে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া এবং ওজস্বিনী বক্তৃতা করা যায় ইহাও আমরা প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের নিকট শিক্ষা করি। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা উহা প্রবর্ত্তিত করেন, সন্দেহ নাই। বিদেশীয় বলিয়া তাঁহারা উহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালায় ধর্ম্মোপদেশ ও বক্তৃতা জীবনশূন্য ছিল। ব্রাহ্মসমাজ উহাকে জীবনী শক্তি প্রদান করেন। হিন্দুসমাজ এখন বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ ও বক্তৃতা দেওয়া পুনর্ম্মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

(৬)

আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না। আমার যে আর অধিক কিছু বলিবার আছে তাহাও মনে হয় না। অতএব প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। ব্রাহ্মসমাজ আমাদের কি করিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার ফল, এ কথা সকলেই জানেন এবং উপরেও ইহা বলা হইয়াছে। কাজে কাজেই যে সকল উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা নিদানপরম্পরা সম্বন্ধে ইংরাজী শিক্ষার ফল বলা যাইতে পারে। অনেকে ইংরাজি শিক্ষার নানা প্রকার দোষ দেন বটে, কিন্তু উহা হইতে আমাদের যে বহুল উপকার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির অবিদিত নাই, এবং কোন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিবেন না। এক কথায় বলিতে

গেলে ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে মানুষ করিয়াছে। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যদি আমাদের সমাজের বর্ত্তমান উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের মূল কারণ ইংরাজী শিক্ষাই হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের আর কি করিবার ছিল? উত্তরে এই-মাত্র বলা যাইতে পারে—ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কাজ—সব পরিবর্ত্তন ও উন্নতিকে দেশী ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করা। কোন কোন পরিবর্ত্তন দেশী ছাঁচে ঢালা না হইলে দেশগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অতি অল্পই ছিল। ঐ সময়ে শিক্ষিত সমাজ কোন্ দিকে পরিচালিত হইতেছিলেন তাহার আভাস উপরে দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় না হইলে প্রাগুক্ত সমাজ কোন দিকে ভাসিয়া যাইত, তাহা অবশ্য ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এ সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। প্রথম অবস্থায় অনেকগুলি উন্নতি ও পরিবর্ত্তন বিদেশীয় গন্ধে দূষিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের বহুল চেষ্টার ফলেই সেই গন্ধের দূরীকরণ সংসাধিত হয়, এবং এখন যে সেগুলি অনেকটা দেশীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার মূল ব্রাহ্মসমাজ। উন্নতি দেশীয় ছাঁচে ঢালা না হইলে বিফল হইবে, এবং জনসাধারণ উহা গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন। দেশের লোকের মন আকর্ষণ করিতে না পারিলে সকল উন্নতির চেষ্টা পণ্ডশ্রম হইবে। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় লোকে ইহা বুঝিতে পারেন নাই বা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। ইংরাজী শিক্ষিত দল বোধ হয় সাধারণ সমাজের কথা ভাবিতেনই না, কিম্বা মনে করিতেন ক্রমে তাঁহারা উহা হইতে পৃথক্ হইয়া না বিলাতী না দেশী এক অভিনব দল হইবেন। তাঁহাদের মন হইতে এই হাস্যোৎপাদক ভ্রম দূর করিবার মূল ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজ ইংরাজী শিক্ষার সুফলগুলিকে যতদূর সম্ভব দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করেন। সব সময় উহা যে জ্ঞানতঃ করা হইয়াছিল এরূপ মনে হয় না। সব সময় যে ঠিক প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল, ইহাও মনে হয় না। তবে অনেক পরিমাণে যে সে চেষ্টা করা-হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজের যে কোন ভুল হয় নাই, বা কোনরূপ দোষ নাই, এ কথা বলি না। সে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা কি উপকার পাইয়াছি তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সকল চিন্তাশীল লোকেই স্বীকার করিবেন যে, অতীতে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে, বর্ত্তমানেও হইতেছে। ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারি না।

দে।

প্রায়শ্চিত্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিশপুরে আজ মহাধূম। জমিদার নবকিশোর বাবুর পৌত্রী নীরজার বিবাহ। উৎসবের আলোকে গ্রামের বৃক্ষগুলি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। অনবরত বাদ্য ও জনকোলাহলে কাহারও ভাষা বুঝা যাইতেছে না, কেবল একটা কর্ণবধিরকারী তুমুল শব্দ, আলোক, এবং জনসমূহের চাঞ্চল্য একটা মহা সমারোহের ব্যাপার জ্ঞাপন করিতেছে।

যথাসময়ে বাদ্য ও কোলাহল দ্বিগুণ হইল। চতুর্দ্দোলে চড়িয়া একটি অজাতশ্মশ্রু বরবেশী বালক আসিয়া সভায় বসিল। নবকিশোর বাবু নবজামাতার চাঁদমুখখানি দেখিয়া আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র বিমলাচরণের একেবারে বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইল। তিনি একটী নিভৃত কক্ষে একজন প্রিয়তম বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বন্ধু বলিলেন "কিহে বিমলা, এই বুঝি এডুকেশন? একটা অপগণ্ড বালকের সঙ্গে সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার এইরূপে বিবাহ দিয়া বুঝি সমাজসংস্কার করিতেছ? ভারতের সর্ব্বনাশকারী বাল্যবিবাহ রোধ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য যে জীবন উৎসর্গ করিবে বলিয়াছিলে, সে সব দীর্ঘ ছন্দে বক্তৃতা, দীর্ঘশ্বাস, সমাজের দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন সব বুঝি (Messএর teapot) মেসের চা-দানীর ধোঁয়ার মেঘে জমিয়াছিল?" বিমলাচরণ চশমাটা নিষ্কারণে খুলিয়া, মুছিয়া, গোঁপ দাড়ীটা চুমরাইয়া আবার তাহা পরিয়া বলিলেন "কি করি বল ভাই? তাঁহাদের মতে নীরজার বিবাহ দেব না, এই কথা বলাতে বাবা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন 'তাহা হইলে তোকে ত্যাজ্যপুত্র করিব জেনে রাখিস্।' বাবার যে কথা সেই কাজ, জান তো ভাই, কাজেই চুপ করিতে হইল। বাবা বর্ত্তমানে আমার কোন আশাই পুরিবে না।" বন্ধু বলিলেন "হাঁ, ত্যাগ করা অম্‌নি মুখের কথা।" বিমলাচরণ বলিলেন "সে কথা পরে হবে, বাবা হয়তো এখনি ডাক্‌বেন। অমন বিবাহ আমি দিতে পারিব না; চল একটু রাস্তায় গিয়া বেড়াই।" বন্ধু বলিলেন "সে ভয় করিও না, সাত বছরের গৌরীদানের ফলে তোমার বাবা তোমাকে ভাগ বসাতে ডাকিবেন না।" "তা না হলেও হয়তো দেখ্‌তে ডাক্‌বেন, চল একটু ও দিকে যাই।" দুই জনে বাটী হইতে বাহিরে বেড়াইতে গেলেন। বৰ্ত্ত নবকিশোর বাবু শুনিয়া বলিলেন "ওটা উচ্ছন্ন গেছে।"

বিবাহ আরম্ভ হইল। নীরজার শুভ্র কোমল ক্ষুদ্র হস্তখানি লইয়া আর একখানি শুভ্র কোমল হস্তে বাঁধিয়া দিবার সময় নব-

কিশোর বাবুর চক্ষে অনাহূত এক ফোঁটা অশ্রু আসিয়া পড়িল, তাঁহার আদরের গৌরী আজ পরের হইল বলিয়া না কি ?

বিবাহের পরে বর কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া নবকিশোর বাবু আশীর্ব্বাদ করিলেন। নীরজা তখন ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিনের উপবাসে ও একটা অজ্ঞাত আনন্দ ও শ্রমে তাহার শুভ্র সুন্দর কচি মুখখানিতে অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষের পাতার উপর একটা ম্লান ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছিল। নবকিশোর বাবু সস্নেহে তাহার স্বেদসিক্ত ক্ষুদ্র ললাটে চুম্বন করিলেন। অস্ফুট আশীর্ব্বাদ তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইল। সেই মুহূর্ত্তে পুরোহিত-প্রমুখ সকলের চীৎকারে তন্দ্রাচ্ছন্না বালিকা চমকিয়া উঠিল। নবকিশোর বাবু সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, বরণডালার প্রদীপের উপরে নীরজার বস্ত্রের স্বর্ণাঞ্চল পড়িয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

অন্য কেহ তাহাদের নিকটে না আসিতে আসিতেই বর নীরজার অঞ্চল টানিয়া লইয়া হস্তস্থ দর্পণের আঘাতে ও ফুৎকারে দিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। নীরজা দেখিল তাহার বরটীতো বেশ সাহসী। বরও সেই সময়ে একবার সভয় ও চকিত দৃষ্টিতে তাহার বধূর মুখখানি দেখিয়া লইল। অগ্নিনির্ব্বাণের পরেও সে দুই তিন বার চোখ তুলিয়া কন্যার দিকে চাহিয়াছিল।

অগ্নি নিভিল, কিন্তু নবকিশোর বাবুর মনের ধুমরাশি মিলাইল না। একি অলক্ষণ !

তাহার পরে নীরজা শ্বশুরবাড়ী যাইল। তিন চারি দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া নবকিশোর বাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "আমায় কোথায় পাঠিয়েছিলে, আমার বাবার জন্যে কত কান্না পেত, দাদার জন্যে কান্না আসত, সব চেয়ে তোমার জন্যে কাঁদতাম, আর মন কেমন করত। আর আমায় সেখানে পাঠিও না, দাদা বাবু"। নবকিশোর বাবু কাতর হইয়া বলিলেন "ছি দিদি, ও কথা বলো না, কেমন সুন্দর শাঁখা পরেছ, সিঁদুর পরেছ ! আরে তারা আমার দিদিকে যে একেবারে মেয়ে মানুষ সাজিয়ে দিয়েছে ! দেখি দেখি !" লজ্জায় নীরজা দাদা বাবুর কোলে মুখ লুকাইল।

চারি মাস পরে সপ্তমী পূজার দিন নবকিশোর বাবু পূজান্তে নীরজাকে কোলে লইয়া নিকটে নবমবর্ষীয় পৌত্র সুরেন্দ্রকেও লইয়া বসিয়া আগমনীর শানাইয়ের আলাপ শুনিতেছিলেন এবং ভক্তির উচ্ছ্বাসে এক একবার কাঁদিয়া ফেলিতেছিলেন। কারণ না বুঝিয়া ও দাদাবাবুর চোখে জল দেখিয়া নীরজার চোখেও জল আসিয়াছিল। চারি দিকে আনন্দ-কোলাহল। সহসা একখানি পত্র আসিল, সংবাদ "—জামাতা ব্রজনাথ মারা গিয়াছে।" নবকিশোর বাবু কিছুক্ষন নীরবে বসিয়া থাকিয়া নীরজাকে ক্রোড়ে করিয়া একটা কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বাহিরের ক্রন্দন-কোলাহল শুনিয়া নীরজা কারণ জানিতে যাইতে চাহিলে তাহাকে বক্ষে

চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "দিদি তুই এইখানে থাক্, বাহিরে যাস্‌নে।" প্রতিমার সেই সপ্তমী পূজার দিন ভিন্ন আর পূজা হইল না। জমিদারবাড়ীর দুর্গোৎসব সেই হইতে বন্ধ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিন পরে বিমলাচরণ শোকাকুল হইয়া নবকিশোর বাবুকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। নবকিশোর বাবু একটীও উত্তর না দিয়া নীরবে সুধু অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। শেষে বিমলাচরণ বলিলেন "আমি আপনার নিকট হইতে চলিলাম, উপার্জ্জনক্ষম হইলে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া যাইব। আপনি অল্প বয়স হইতে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, বালক-বয়সে আমার বিবাহ দিয়া আমার সমস্ত জীবন অসার করিয়া দিয়াছেন, তাহা না হইলে এত অল্প বয়সে আমাকে এরূপ সাধারণ বঙ্গবাসীর মত জীবনের সূত্রপাত দেখিতে হইত না। আমি কি আশা করিয়াছিলাম, আমি কি হইতাম তাহা আপনাকে আর কি বলিব, আপনার অদৃষ্টে সেইরূপ পুত্র নাই, তাই আমার সর্ব্বনাশ করিলেন। যাক্ আমি চলিলাম, আপনি জাতিকুল লইয়া থাকুন।" মর্ম্মাহত নবকিশোর পুত্রের হাত ধরিলেন। পুত্র শুনিল না, যাইবার সময় বলিয়া যাইল "নীরজাকে তাহার বৈধব্যের কথা বলিবেন না, আমি আপনার ন্যায় নির্ম্মম নই, আমি তাহার পিতা, তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিব।

বিমলাচরণ উপার্জ্জনেচ্ছায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। নবকিশোর বাবু চক্ষু মুছিতে মুছিতে নীরজা ও সুরেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন। পৌত্র সুরেন্দ্রের অপেক্ষা নীরজাকে তিনি অধিক ভাল বাসিতেন।

বিমলাচরণ বলিয়া গিয়াছে "নীরজাকে বৈধব্যের কথা জানাইও না"। নবকিশোর বাবু ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিলেন ইহা না জানাই ভাল, যতদিন না বুঝে সুখে থাকিবে। তবে বিমলাচরণের শেষের কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না।

প্রথমে যখন নীরজার সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া ও নোওয়া খুলিয়া দেওয়া হইল, তখন সে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল। কান্নাকাটীতেও সে ততোধিক বিস্মিত হইল। তাহার মাতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বেশী কাঁদিয়া উঠিলেন, সেইজন্য আর নীরজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। একদিন ভয়ে ভয়ে তাহার দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। যখন দেখিল দাদাবাবুও মুখ ঢাকিল, তখন সে তাহার কৌতূহলবৃত্তি প্রশমিত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, সে সব ভুলিয়া গেল। সুন্দর বরটীর কথা বিবাহের পর প্রথম প্রথম কয়েক দিন মনে পড়িয়াছিল, তারপরে একটা খেলানা পাইলে শিশু যেমন হারান খেলানাটী ভুলিয়া যায়, নীরজাও তেমনি বরটীর মুখখানি বিস্মৃত হইয়াছিল। তবে যখন তাহার বরের কথা সকলে বলিত, তখন সে জানিত তাহার বর বলিয়া কিছু ছিল।

তাহার পরে সে সব কথা আর কেহ বলিত না, কাজেই সেও তাহাকে ভুলিয়া গেল। মনে করিয়া দিবারও কেহ ছিল না, কেননা নবকিশোর বাবু কোনও বালক বালিকার সহিত তাহাকে খেলিতে বা মিশিতে দিতেন না। নীরজার জ্ঞানের উন্মেষ হইলে ভ্রাতা সুরেন্দ্র ও দাদাবাবু তাহার খেলার, গল্পের, আমোদের ও হাসির সঙ্গী, এখনও তাহাই।

নবকিশোর বাবু পূর্ব্বে তাহাকে পড়িতে শিখাইয়াছিলেন, এখনও তিনি একাগ্রচিত্তে নীরজার শিক্ষার দিকে যত্ন করিতে লাগিলেন। যেমন পাঠ্য পুস্তক পড়াইতেন, সেই সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, সীতার বনবাস, রামবনবাস প্রভৃতি পড়াইতেন এবং সন্ধ্যায় ও সকালে বাগানে গঙ্গার সোপানে নীরজা ও সুরেন্দ্রকে দুই দিকে বসাইয়া আপনি মধ্যে উপবেশন করিয়া কত নীতিপূর্ণ পৌরাণিক গল্প বলিতেন। কেমন করিয়া পাঁচ বৎসরের শিশু ধ্রুব পদ্মপলাশলোচনকে আকুলপ্রাণে ডাকিতে ডাকিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দুঃখিনী মাতার করুণ বিলাপ শুনিয়া কেমন করিয়া গাছের পাখীগুলাও কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমার প্রহ্লাদ হরির নামে সর্ব্বত্যাগী হইয়া কত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। রাজকন্যা সীতা ও সাবিত্রীর কথা, তাঁহারা কেমন করিয়া পিতা, মাতা, শ্বশুর, শশ্রু, পতি ও আত্মীয় স্বজনকে প্রীত করিয়াছিলেন। রাজকন্যা হইয়া তাঁহারা কত কষ্ট সহিয়াছিলেন। কেমন করিয়া সাবিত্রী যমের নিকট হইতে মৃত পতিকে বাঁচাইয়াছিলেন, ইত্যাদি বহু নীতি ও ভাবপূর্ণ কথা নবকিশোর বাবু গম্ভীরকণ্ঠে তাহাদিগকে বলিতেন। কখন কখন নবকিশোর বাবু রামবনবাসের ও সীতাবিসর্জ্জনের ছবি আনিয়া সেই শোকাবহ ঘটনার গল্প বলিতেন। তখন নীরজা শোকাভিভূত ও ব্যথিতহৃদয় হইয়া সত্য সত্যই কাঁদিয়া উঠিত। আবার রামের বন হইতে পুনরাগমন, রাজ্যপ্রাপ্তি, সীতা উদ্ধার শুনিয়া শান্ত হইয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিত। রাত্রিকালে সেই সকলই স্বপ্নে যেন প্রত্যক্ষ দেখিত।

প্রভাতে নবকিশোর বাবুর সহিত পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া নীরজা তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া দিত। নবকিশোর বাবু চন্দনের ফোঁটা পরিয়া তাহাকে একটী পরাইয়া দিতেন। তখন নীরজা পড়িতে বসিত। নবকিশোর বাবুর পত্নী বর্ত্তমান ছিলেন না, সুতরাং নীরজার মাতাই গৃহিণী।

বাহিরে ভিক্ষার্থী আসিলে নবকিশোর বাবু তাহাকে অন্দরে ডাকিয়া আনিতেন। নীরজা মহানন্দে তাহাকে নিজে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইত। পরে তাহার প্রার্থিত দ্রব্য নীরজার হাত দিয়া তাহাকে দান করাইয়া নবকিশোর বাবু তাহাকে বিদায় দিতেন। নীরজার আনন্দে নবকিশোর বাবু ক্রমশঃ সব দুঃখ ভুলিতে

লাগিলেন। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিসে এই কোমল কলিকাটির গায়ে সংশয়ের একটুও রৌদ্র না লাগিতে পারে। তাই নিজের বিশ্বাস, চেষ্টা ও পবিত্রতার দ্বারা নীরজার মুকুলসদৃশ জীবনটি ধীরে ধীরে প্রস্ফুট করিতে লাগিলেন। হায় নির্ব্বোধ মানব! কার্য্য-কারণপরম্পরাগ্রথিত নিয়তির যে গতি, তোমার কি সাধ্য তাহা রোধ কর! বৃথা আকুল চেষ্টায় ব্যাকুলপ্রাণে নিয়মের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছ।

এমনি করিয়া দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রকে বিমলাচরণ এক বৎসর পরেই কলিকাতায় লইয়া গিয়াছেন। সেখানে বিমলাচরণ ওকালতি করেন, এখন বেশ পসার হইয়াছে। তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পাঠাইবার জন্য পিতাকে লিখিয়াছিলেন। নবকিশোর বাবু কোন উত্তর না দেওয়ায় পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন যে, আমি পূজার বন্ধে গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিব, তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

প্রার্থনা।

হৃদয়মন্দির মম তোমারি নিলয়ভূমি,
কোথায় খুজিনু বৃথা আমারি অন্তরে তুমি।
এস নাথ প্রকাশিয়া জুড়াক তাপিত প্রাণ,
জীবনের ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাক অবসান।
যখন তোমারে খুঁজে ভ্রমিলাম বিশ্বমাঝ
অন্তরে নীরবে বসে দেখেছিলে বিশ্বরাজ।
হৃদয় ভকতি পুষ্পে সযতনে মালা গাঁথি
কাহারে পরাব ভেবে কাটায়েছি সারা রাতি।
ফিরেছি মন্দিরদ্বারে হাতে লয়ে গাঁথা মালা
রুদ্ধদ্বার খোলেনি ত বৃথা চলে গেছে বেলা।
এখন শুকাল ফুল নাহিক সুরভি আর
কি দিব কি আছে মম আছে মাত্র ভক্তি হার।
লহ নাথ লও তুলি দাও ও চরণে স্থান,
দীনের এ তুচ্ছ দানে করিও না প্রত্যাখ্যান।
যখন খুলেছ দ্বার তখন দিয়েছ দেখা,
রেখিও না দ্বার পুনঃ আঁধারে রেখ না একা।
তোমারি মন্দিরে বসি তোমারে পূজিব আমি।
সে পূজা অন্তরে তুলে নিও তুমি অন্তর্যামি!

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

ভ্রমণ-কাহিনী।

(একজন বন্ধুর কথা।)

আমার বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন আমি পুরীতে ছিলাম। প্রায়ই প্রত্যহ জগন্নাথদর্শন হইত। বিমলা দেবীর রাঙ্গা পা দুখানিতে রাঙ্গা জবার অঞ্জলী দিতে কি ভালই লাগিত। আর কি সুন্দর সমুদ্র, তাহার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কত সুন্দর সুন্দর ঝিনুক কুড়াইতাম। সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে কত লুটাপুটি খাইতে হইত। স্নানের সময় তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইত। এক দিন আমি ও আমার বন্ধু রমেশ খণ্ডগিরি দেখিতে গিয়া, তাহার অদূরস্থ জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। ইহা যে দেবস্থান, দেবস্থানের মধ্যে হিংসা অনুচিত, সে কথা যেন কে ভুলাইয়া দিয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল এমন সময় আমরা একটী হরিণ দেখিতে পাইলাম। আমাদিগকে দেখিয়া হরিণটী প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। দুই দিক হইতে দুইজনে তাহাকে তাড়া করিলাম। আমাদের দুই জনেরই হাতে দুইটি বন্দুক ছিল। দুই জনেই একসঙ্গে গুলি করিলাম। আহত হইয়া একবার মাত্র সে আমাদের দিকে চাহিয়া সেইখানেই পড়িয়া গেল। তাহার বড় বড় চোখ দুইটীতে কষ্টের চিহ্ন মিলাইয়া গেল। এমন সময় একটী গর্জ্জনশব্দ শুনিয়া পিছনে চাহিয়া দেখি "এক প্রকাণ্ড ভাল্লুক"। ভয়ে আমাদের তো শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। আমি রমেশকে বলিলাম "এখনই আমরা নির্দ্দোষ হরিণটিকে মারিলাম তাহারই ফল পাইতেছি, যাহা হউক সাহসে বুক বাঁধ"। আমি সাহসে ভর করিয়া বন্দুক উঠাইলাম। রমেশও উঠাইল, কিন্তু তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। আমি ভাল্লুকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম। আমার গুলি মস্তকে না লাগিয়া পৃষ্ঠে লাগিল, কিন্তু রমেশের গুলি ভাল্লুকের মাথায় লাগিল। তখন ভাল্লুক চিৎকারে বন কাঁপাইয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল। আমরা আবার গুলি করিলাম, ভাল্লুক মরিয়া গেল। আমরা আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তার পর আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ এরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে না, আমরা রক্ষার অযোগ্য হইলেও তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নাই, হরিণটীর সেই দৃষ্টির কথা মনে করিয়া প্রাণে কষ্ট হইল। ভাল্লুক ও হরিণ মারিয়াছি, বাড়ী

আসিয়া সকলের নিকট গল্প করিলাম, কিন্তু আহ্লাদ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, এখনও মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হয় যে, নির্দ্দোষ হরিণটীকে খেলার ছলে হত্যা করিয়াছি, তাহার ফলে আমাদেরও সেই রকম তাড়া খাইয়া মরিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

শ্রীমতী কল্পনা দেবী।

(১১ বৎসরের বালিকা।)

মারসী মারভিল্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"তাহা হইলে আমাকে শীঘ্রই মরিতে হইবে, আর—"। লেডি পমরয়ের ভ্রাতা লেডি পমরয়কে এরূপভাবে অনর্গল বকিয়া যাইতে শুনিয়া ভৎর্সনাসূচক স্বরে বলিলেন "কি মিথ্যা বকিতেছ?"

লেডি পমরয় ভ্রাতার এইরূপ বাধা গ্রাহ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"আমি মরিয়া গেলে পর যখন আমার মৃত দেহ ফুল ও ফুলের মালায় সজ্জিত করিয়া সমাধিস্থানে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন আমাকে কেমন সুন্দর দেখাইবে। আমার স্বামী কেমন বিষণ্ণ ও নতবদনে আমার শবাধারের অনুগমন করিবেন। সকলে, ধীরে ধীরে কথা কহিবে। আমি এখনই যেন ভৃত্যদিগকে বলিতে শুনিতে পাইতেছি যে, আমার ন্যায় সৎলোকেরা এই মলিন পাপপূর্ণ পৃথিবীতে থাকিবার উপযুক্ত নহে। সৎলোকেরা অধিক দিন পৃথিবীতে অবস্থান করেন না, কারণ দেবলোকে তাঁহাদিগের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবশ্য আমার শবাধারটি দেখিতে অতিশয় সুন্দর হইবে, এবং চারিটি শ্বেতবর্ণের অশ্ব তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইবে। আমার স্বামীর সহিত এই সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ইতিপূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি। আমার শবাধার শ্বেত অশ্বেই বহন করিবে। দীর্ঘ-লাঙ্গুল-বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব শবাধার বহন করিতেছে ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। দীর্ঘলাঙ্গুলযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব দ্বারা আমাদের শবাধার বহন করাইবার রীতি কেন যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

লেডি মেরি লেডি পমরয়কে এইরূপ ভাবে কথা বলিয়া যাইতে শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"প্রিয়তম ডলি, এ কি ভীষণ কথা? তুমি কি বলিবার আর কিছু পাইলে না? কেমন করিয়া তুমি এমন কথা মনে আনিতেছ? তোমার ঐরূপ ভীষণ কথা শুনিয়া আমার হাত পা সমস্ত শিথিল হইয়া আসিতেছে।

লেডি পমরয়ের ভ্রাতা লেডি মেরিকে

বলিলেন হাঁ, লেডি মেরি, ডলি কি নিষ্ঠুর কথাই বলিতেছে। ইহা শুনিলে যথার্থই শরীর শিহরিয়া উঠে, উহাকে নিরস্ত করুন। উহাকে না নিরস্ত করিলে ঐ বিষয় লইয়া ও আধ ঘণ্টা ধরিয়া বাকতে থাকিবে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং কুকুর ও ঘোড়ায় পরস্পরে কি কথা বলিয়া থাকে, ডলি সেই বিষয়ে কথা বলিতে অতিশয় ভালবাসে। আমি এমন অর্থহীন কথা আর কখন কাহাকে বলিতে শুনি নাই।

লেডি পমরয় তাঁহার ভ্রাতার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"তুমি নিশ্চয়ই অতি নির্ব্বোধ। ইহা অর্থহীন কথা নহে। কুকুর ও ঘোড়ায় নিশ্চয়ই পরস্পরে কথা বলিয়া থাকে। আজ প্রাতে যখন আমি আমার ঘোড়া জ্যাককে বলিলাম "জ্যাক্ আজ আমি তোকে ভ্রমণার্থ বাহিরে লইয়া যাব, তখন সে আমার কথা শুনিবামাত্র দৌড়িয়া অশ্বশালে শৃঙ্খলাবদ্ধ 'স্যালী' নামক ঘোড়ার সহিত কি কথা বলিতে গেল। সে নিশ্চয়ই স্যালীকে তাহার বাহিরে বেড়াইতে যাইবার কথা বলিয়াছিল, তাহা না হইলে স্যালী এত রাগিয়া উঠিবে কেন?"

লেডি মেরি লেডি পমরয়কে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে পাদরী আনষ্ট্রুথারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "আমার বিশ্বাস, মিষ্টার আনষ্ট্রুথার কোন একটি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা আমাদিগকে বলিতে আসিয়াছেন, নতুবা তাঁহাকে এত গম্ভীর ও চিন্তিত দেখাইতেছে কেন? মিঃ আনষ্ট্রুথার আপনার কি বক্তব্য বলুন, আমি শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।"

পাদরী আনষ্ট্রুথার এই সময় একটা উচ্চ চৌকির উপর হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক চিমনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি লেডি মেরি কর্ত্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি নির্ভীক দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "লেডি মেরি, আমি আপনার নিকট একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, তাহা অত্যন্ত গুরুতর। সে অনুগ্রহটি এই যে ইলষ্টেল পল্লীবাসিগণের যাহাতে ধর্ম্মে মতি হয়, সেরূপ কার্য্যে আপনাকে সানুরাগ সাহায্য দান করিতে হইবে।"

লেডি মেরি বলিলেন "হাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি সর্ব্বদাই আমার উপর সেজন্য নির্ভর করিতে পারেন।" পাদরী আনষ্ট্রুথার কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা লেডি মেরির নিকটি যে নিতান্ত অসামঞ্জিক ও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে সেইক্ষণে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তিনি চলিয়া যাইতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি মনকে দৃঢ় করিয়া লেডি মেরির কথার উত্তরে বলিলেন "আপনি সচারচর দরিদ্রপল্লীবাসিদিগকে অর্থ ও বস্ত্রদানে যেরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন, আমি সেরূপ সাহায্য প্রার্থনার

জন্য এবার আসি নাই। আমি তাহা অপেক্ষা অন্য মহত্তর অনুগ্রহ প্রার্থনার জন্য আসিয়াছি। যদ্যপি সে অনুগ্রহটি বড় অতিরিক্ত বলিয়া আপনার মনে হয়, তবে আমাকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। এখানকার পল্লীবাসিগণের মধ্যে সতত আপনার উপস্থিতি এবং তাহাদের দুঃখ, কষ্ট ও শোকে আপনার ব্যক্তিগত সহানুভূতি প্রার্থনার জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।”

যখন তিনি এই কথা বলিতেছিলেন, তখন তিনি সেই মহার্ঘ চিত্র ও আসবাব-সজ্জিত ক্র্যান্‌বয়েন-প্রাসাদ, লেডি সমরস ও তাঁহার ভ্রাতার হাস্যোজ্জ্বল ও বিদ্রূপসূচক নয়ন এবং তাঁহার প্রার্থনাটি কতদূর সঙ্গত, ইহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কেবল মাত্র তাঁহার ধর্ম্মমণ্ডলটির অন্তর্গত দীন পল্লীবাসিগণের কথা তিনি স্মরণ করিতেছিলেন। তিনি কেবলি জীবন-সংগ্রামে পিষ্ট, দীন পল্লীবাসিগণের কথা ভাবিতেছিলেন। তাহারা দুঃখ, কষ্ট ও শোকের সময় তাঁহারি উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারি নিকট সাহায্যের জন্য আগমন করিয়া থাকে। ক্রাইষ্ট যেরূপ সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাদের সমস্ত পাপ, তাপ, মালিন্য বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ সেই দীন পল্লীবাসিগণের প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে হাস্য, বিদ্রূপ ও তিরস্কারের পাত্র হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

“লেডি মেরি! আপনার নিকটে এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত এই পল্লীটির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধীয় কার্য্যে পাঁচ বৎসর ধরিয়া অবিরত পরিশ্রম করিবার পর আমি সম্পূর্ণরূপে অসিদ্ধ হইয়াছি।”

লেডি মেরি তাঁহার এইরূপ নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথার উত্তরে সকরুণ অথচ উৎসাহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

“না, না, আপনি একটুও অসিদ্ধ হয়েন নাই। আর এখন যখন আমি—”। পাদরী আনষ্টুথার লেডি মেরিকে আর বলিতে দিলেন না। তিনি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—

“না যথার্থই আমি অতি শোচনীয়রূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছি। মানবজীবন এবং সমস্ত মানবীয় দুঃখ, কষ্ট ও শোক ঈশ্বরের প্রদত্ত দান মাত্র, ইলষ্টেণগ্রামবাসিগণের নিকটে সে সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে আমি এক্ষণে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। সম্প্রতি গ্রামে অত্যন্ত মৃত্যু ও পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আজ জন মরগানের একটিমাত্র কন্যা মারা গিয়াছে।”

চিরদুঃখী জন মরগানের একমাত্র কন্যাটির মৃত্যু হইয়াছে শ্রবণ করিয়া লেডি মেরি গভীরসহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

"আমি এ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।"

তৎপরে আনষ্টুথার পূর্ব্ববৎ সতেজ ও উৎসুক্যপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"সম্প্রতি শেডনের বিধবা স্ত্রীর একমাত্র পুত্রটিরও মৃত্যু হইয়াছে। কৃষক ডেবিডের পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। দৈবাৎ পড়িয়া যাওয়ায় তাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আমি আপনাকে গ্রামবাসিগণের এইরূপ দুঃখ ও দুর্দ্দশা সম্বন্ধে বহু সংবাদ প্রদান করতে পারি। কিন্তু এই প্রকার দুঃখ ও দুর্দ্দশার কাহিনী বিবৃত করিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহস করি না। বন্যায় ও তুষারপতনে সম্প্রতি শস্যেরও বহু ক্ষতি হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ এতদিন অতি সাহসের সহিত এই সমস্ত দৈবদুর্ব্বিপাক ও দুঃখদুর্দ্দশার সহিত সংগ্রাম করিতেছিল। এতদিন তাহারা সমস্ত জাগতিক দৈবদুর্ব্বিপাক ও দুঃখ দুর্দ্দশা যে ঈশ্বরের বিশেষ বিধান, তাহাতে কোন সন্দেহ করিত না।

কিন্তু সম্প্রতি তাহারা বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি বহু চেষ্টায় তাহাদের বিশ্বাসহীনতা দূর করিতে পারিতেছি না। তাহারা আমার উপদেশ ও বাক্য অপরিণতবয়স্ক ব্যক্তির উক্তির ন্যায় উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, আমি জগতের কিছুই জানি না। মূল কথা এই যে, তাহাদের অজ্ঞতাই তাহাদের কাল স্বরূপ হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির প্রতি আরচরণ।

ভোগিনী শব্দের অর্থ যাহার ভোগ অর্থাৎ সুখভোগ আছে। প্রকৃত ভাবে বলিতে গেলে বিলাসোপভোগের জন্য গৃহীতা হইতেন বলিয়া রাজার তাদৃশ পত্নীগণ ভোগিনীপদবাচ্য হইতেন। মহিষী ও ভোগিনী, এই দুই নামের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও জানা যায় যে, নৃপতিদিগের ধর্ম্মাচরণের জন্য একটী মাত্র পত্নী হইলেই চলিত। অতএব একাধিক বিবাহ করার আবশ্যকতা (অনেক স্থলেই) দৃষ্ট হইত না। আর্য্যগণের একপত্নীক ব্রতপালনই প্রশংসনীয় ছিল।

পূর্ব্বকালে বহু বিবাহ, বিলসনশীল নৃপতিদিগের মধ্যেই বহু প্রচলিত এবং তদন্যত্র সচরাচর বিরল ছিল। তৎকালে স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্বয়ম্বর-সভায় নিমন্ত্রিত অনেক বিবাহিত ভূপালদিগের সম্বন্ধেও এরূপ জানা যায় যে, অনেকানেক প্রসিদ্ধ রাজা ধর্ম্মপত্নী বা রাজমহিষী ভিন্ন আর দারপরিগ্রহ না করিয়া রাজসমাজে এক-

পত্নীক ব্রতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

গৃহস্থগণ বিনা কারণে ও বিনা দোষে পত্নী পরিত্যাগ করেন অথবা দারান্তর পরিগ্রহ করেন, ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত ছিল না। কিরূপ অবস্থায় পত্নীর সংশ্রব ত্যাগ অথবা দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে ভগবান্ মনু কতিপয় বিধি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। পত্নী যদি শত্রুভাবাপন্ন হন, তবে তাঁহার সেই দ্বেষভাব বিদূরিত হইল কি না তজ্জন্য স্বামী এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন। যদি উক্ত সময়ের মধ্যেও তাঁহার সেই ভাব বিদূরিত না হয়, তবে স্বামী তাঁহার সহিত একত্র বাস ত্যাগ করিবেন। যদি স্ত্রী মদ্যপায়িনী, অসাধুশীলা, প্রতিকূলা (স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্যকারিণী), চিররুগ্না, অত্যন্ত ক্রূরস্বভাবা বা অর্থনাশিনী হন. তবে স্বামী পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন স্বামী,স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কেবল-কন্যা-প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিত পারেন ; কিন্তু স্ত্রী যদি অপ্রিয়বাদিনী (স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা অযথা অশ্রাব্য কটুভাষিণী) হন, তবে সদ্যঃ অর্থাৎ যখন অসহ্য হয়, তখন কালাতিপাত ব্যতিরেকে দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত যে কয়টী কারণে পুরুষের দারান্তরপরিগ্রহের বিধি শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনটীও অযৌক্তিক নহে। অযৌক্তিক হইলে শাস্ত্রকারগণ সেরূপ বিধান কেনইবা করিতে যাইবেন। স্ত্রীকে দ্বেষভাবাপন্না জানিতে পারিলেই তাহাকে ত্যাগ করিবার বিধি নাই। তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয় কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য এক বৎসর কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মদ্যপায়িনী নারী মস্তিষ্কবিকৃতি নিবন্ধন কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে পারে না, তাহাকর্ত্তৃক ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যও অনুষ্ঠিত হয়. এই জন্য ঐরূপ স্ত্রী ত্যাগার্হা। অসাধুশীলা ভার্য্যা দ্বারা কুলের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষা হয় না বলিয়া পতিকে পদে পদে অবমানিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়, এই জন্য ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রী বর্জ্জনীয়া। পত্নী যদি স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য করে, তবে তাহাকে লইয়া গৃহস্থের সুখশান্তির সম্ভাবনা কোথায় ? সুতরাং তথাবিধা পত্নী সত্ত্বেও গৃহস্থ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন। পতির সহিত পত্নীর অকপট ব্যবহার কর্ত্তব্য। যেখানে কপটতার প্রাদুর্ভাব, সেখানে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? এই জন্য স্ত্রী ক্রূরস্বভাবা হইলে গৃহস্থের পক্ষে দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করা নিন্দনীয় নহে। গৃহস্থের পক্ষে অর্থের সদ্ব্যবহার ও সঞ্চয় প্রধান কর্ত্তব্য, তাহাতে আবার অনেক ব্যয়ভার গৃহিণীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। গৃহিণী গৃহস্থের আয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া যদি অপরিমিত ব্যয় করেন, তবে সেই সংসার শোচনীয় দশায় উপনীত হইতে পারে।

ঐরূপে অতিব্যয়হেতু যাহাতে গৃহস্থের সংসার হীনদশাপন্ন হইতে না পারে, তদুপায়বিধানার্থ শাস্ত্রকারগণ গৃহীকে ব্যয়শীলা স্ত্রী সত্ত্বেও দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে বলিয়াছেন। চিররুগ্না স্ত্রীদ্বারা তাঁহার সাংসারিক কার্য্য ও সুশৃঙ্খলতা চলিতে পারে না। পত্নী চিররুগ্না এবং বন্ধ্যাত্বাদি দোষে দূষিতা হইলে, গৃহস্থ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীকে ভরণ পোষণ হইতে বঞ্চিতা করিতে পারিবেন না। স্ত্রী বন্ধ্যা ও চিররুগ্না হইলে তাঁহার অনুমতি লইয়া পুরুষকে বিবাহ করিতে হইত। গুণবতী ভার্য্যাও তাদৃশ স্থলে পতিকে স্বচ্ছন্দচিত্তে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহের অনুমতি দিতেন। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলেও কোন কোন গৃহস্থ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেন না। তাঁহারা ভাবিতেন যে, অদৃষ্টে পুত্রলাভ না থাকিলে ভার্য্যান্তরগ্রহণ করিলেও ত পুত্র না জন্মিতে পারে? অনিশ্চিত পুত্রলাভের প্রত্যাশায় বিশুদ্ধ-প্রণয়িনী ধর্ম্মপত্নীর সপত্নীভাব মাত্র স্থাপিত হইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা বন্ধ্যা পত্নী সত্ত্বেও পুত্রলাভকামনায় পুনর্ব্বার দার গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করিতেন না। প্রাচীন আর্য্যসমাজে পবিত্রতা, সংশিক্ষা ও সাধু দৃষ্টান্ত প্রভাবে মদ্যপায়িনী, অসাধুশীলা, প্রতিকূলা ও ক্রূরস্বভাবা ভার্য্যা প্রায়ই থাকিত না বলিয়া গৃহস্থের পক্ষে ঐরূপ স্থলে পুনর্ব্বার বিবাহেরও প্রায় প্রয়োজন হইত না। ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে পতি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধেও কতকগুলি বিচার করিবার বিষয় ছিল। অনেক সময়েই ত দম্পতীমধ্যে কলহ ঘটে, সেই কলহোপলক্ষে অধৈর্য্যা হইয়া গৃহিণী যদি হঠাৎ কোন অপ্রিয় বাক্য বলেন, তাহা হইলেই কি গৃহস্থ তাহাকে অপ্রিয়বাদিনী বলিয়া স্থির করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন? তাহা কখনই নহে। স্বামীকে চরিত্রদোষ বা অবিমৃষ্যকারিতা বশতঃ কোন দুষ্কার্য্যে রত হইতে দেখিলে যদি স্ত্রী কোন অপ্রিয় হিতবাক্য বলেন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে অপ্রিয়বাদিনী বলিয়া বুঝিতে হইবে? অথবা কষ্টবিশেষে পড়িয়া যদি মনের দুঃখে স্বামীকে অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও কি তাঁহাকে অপ্রিয়বাদিনী বলিয়া স্থির করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে হইবে? তাহা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। অপ্রিয় ভাষা যে নারীর স্বভাবসিদ্ধ দোষ, তাহাকেই অপ্রিয়বাদিনী বলিয়া জানিবে। বিশুদ্ধচরিত্র ও কার্য্যাকার্য্যবিশেষজ্ঞ পতি যথোপযুক্ত ভরণ পোষণ, প্রণয় প্রদর্শন, সদয় ব্যবহার ও মিষ্ট ভাষণ দ্বারা তুষ্ট করিলেও যে নারী প্রকৃতিগত অভ্যাস বশতঃ সর্ব্বদা অযথা অশ্রাব্য কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া স্বামীকে শান্তিলাভ করিতে দেয় না, সেই প্রকৃত অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী। আত্মীয়, পরিচিত ও গ্রামবাসিমাত্রেই যাঁহাকে ঐরূপ মুখরা ও স্বামীর

অশান্তিবিধায়িনী বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃত অপ্রিয়বাদিনী। ঐরূপ স্ত্রীর ব্যবহার যখন অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে, তখন স্বামী দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের চেষ্টা করিবেন। উক্ত বিষয়ে আর অধিক বিস্তারিতরূপে না বলিলেও চলে। শাস্ত্রে বিনা কারণে একাধিক দারগ্রহণের বিধি নাই বলিয়া বোধ হয় প্রাচীন আর্য্যগণ ধর্ম্মপত্নীর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম কাব্যতীর্থ
ও পুরাণতীর্থ।

বাঘের আত্মকাহিনী।

চারি দিকে কেবলই মানুষের মুখ। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি এবং বোধ হয় শীঘ্রই মরিয়া যাইব। আমার একটা নির্জ্জন স্থানে মরিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এখানে তাহার কোন আশাই নাই। কারণ যখনই আমি বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই কৌতূহলাক্রান্ত মানুষের মুখ দেখিতে পাই। লোকে আমাকে ৭।৮ সের সিদ্ধ ঘোড়ার মাংস খাইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। তাহারা যদি আমাকে যৌবনকালে একটী বন্যমহিষ খাইতে দেখিত, তাহা হইলে না জানি কি বলিত! এখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খোঁচা মারিয়া আমার সহিত খেলা করে, কিন্তু এক সময়ে আমিই বিড়াল যেরূপ ইঁদুর ধরিয়া খেলা করে, সেইরূপ মানুষ ধরিয়া খেলা করিয়াছি। ছেলেবেলা হইতে আমার কাহিনীটা তবে তোমাদিগকে বলি।

এ যেন ঠিক কাল্‌কের কথা। আমি ও আমার দুই ভাই "সের আলি" এবং "আফজল খাঁ।" গুহার বালিভরা মেঝের উপর লুটোপুটী খাইয়া কত রকমই খেলা করিতাম। আমরা গুহার মুখ হইতে অদূরবর্ত্তী মাঠে মা ও বাবাকে শিকার করিতে দেখিতে পাইতাম। যে দিন আমি প্রথম একটি হরিণ শিকার করি, সে দিনের কথা কি কখনও ভুলিতে পারিব? হরিণটা মাঠের মধ্যে চরিতেছিল। তাহার মধ্যে কেবল কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ ছিল। আমি গুড়ি মারিয়া এ ঝোপ হইতে ও-ঝোপে যাইতেছিলাম। যখনই হরিণটা মাথা তুলিতেছিল, তখনই আমি মাটীতে শুইয়া পড়িতেছিলাম। অনেকক্ষণ এইরূপ করিবার পর আমি শেষ ঝোপটার নিকটে পৌঁছিয়াছিলাম। হরিণটাও বিপদের আশঙ্কা না করিয়া চরিতে চরিতে সেইখানে আসিল। হঠাৎ এক লাফে আমি তাহার পিঠে চড়িয়া তাহার ঘাড় মট্‌কাইতে লাগিলাম। কিন্তু বলিতে লজ্জা করে, তখন আমি অত্যন্ত

ছোট ছিলাম বলিয়া হরিণটা আমাকে পিঠে করিয়াই দৌড়িয়া গেল। যাহাহউক কোন প্রকারে আমি তাহার টুঁটিটা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

তাহার পরে যে ঘটনাটী ঘটে, তাহা এরূপ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয় নাই। আমরা তিন ভাই তখন প্রায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং নিজেরাই শিকার করিতে পারিতাম। একদিন আমরা তিনজনে একটা ডোবাতে জল খাইতেছিলাম এমন সময়ে একটা বন্যশূকর আসিয়া আমাদিগের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই জল খাইতে আরম্ভ করিল। সের আলির মেজাজটা একটু কড়া ছিল, সে রুক্ষস্বরে শূকরকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিল। কিন্তু শূকর তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ইহাতে সের আলি ভয়ানক রাগিয়া শূকরটার উপর লাফ দিয়া পড়িল। শূকর চকিতের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল এবং সের আলি তাহার পিঠে না পড়িয়া তাহার তীক্ষ্ণ দন্তের উপর পড়িল। শূকরটা দাঁত দিয়া সের আলির চামড়া ছিঁড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া আমরা কাপড় ছেঁড়ার মত একটা চড় চড় শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম। সের আলি এই আঘাতে একটু কাবু ও অবাক্ হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই সামলাইয়া লইয়া আবার শূকরটার দিকে লাফ দিল। এবারও শূকরটা দাঁতের আঘাতে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। সের আলির শরীর তখন রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। সে নিজে আর আক্রমণ না করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। শূকরটা একটুও ভয় না পাইয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। এবার সের আলি লাফাইয়া শূকরটার মস্তক ডিঙ্গাইয়া একেবারে তাহার পৃষ্ঠে পড়িল। কিন্তু শূকর মাটীর উপর গড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে পিঠ হইতে ফেলিয়া দিল। কিছুক্ষণ দুইজনে মাটীতে লুটাপুটী খাইয়া পরক্ষণেই শূকর অগ্রে মাটী হইতে উঠিয়া দন্ত দ্বারা সের আলির পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত চিরিয়া দিল। এই আঘাতেই সের আলি একটা কষ্টসূচক চীৎকার করিয়া থাবার এক আঘাতে শূকরের মাথার চামড়া তুলিয়া দিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আমি ও আফজল খাঁ সের আলির সাহায্যের জন্য আগেই যাইতাম, কিন্তু তাহার একটা বন্য শূকর মারিবার ক্ষমতা আছে, এই বলিয়া সে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিল।

এখন সের আলির মৃত্যুতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমি ও আফজল খাঁ এক সঙ্গে শূকরটাকে আক্রমণ করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি ঐ শূকরটা অতিশয় সাহসী ছিল। সে আমাদের দুজনের আক্রমণ এমন স্থিরভাবে সহ্য করিয়াছিল, যেন তাহার পক্ষে একটা বাঘকে মারিয়া অপর দুইটা বাঘের সহিত যুদ্ধ করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

সের আলির অবস্থা বুঝিয়া আমরা সাবধান হইয়া গিয়াছিলাম এবং তাহার

নিকটে না যাইয়া দূর হইতেই তাহার চারি পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া আমাদের যুদ্ধ চলিল। সের আলিপ্রদত্ত মাথার আঘাত হইতে রক্ত গড়াইয়া চোখে পড়ায় শূকরটা ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না, বোধ হয় বিরক্ত হইয়াই লড়াই শেষ করিবার জন্য সে আফজল খাঁকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিল। আফজল খাঁও লাফাইয়া তাহার পৃষ্ঠে পড়িল। শূকরটা সের আলিকে যেমন করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়াছিল, আফজল খাঁকেও সেইরূপে ফেলিবার চেষ্টা করিবে ভাবিয়া আমি প্রস্তুত হইয়াছিলাম এবং যেমনি সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল অমনি তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিলাম। শূকরটা অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াও আমার কামড় ছাড়াইতে পারিল না। অবশেষে একটা গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া সে মরিয়া গেল। এই জয়ে আমাদের গর্ব্ব করিবার কিছুই ছিল না। ইহাতে সের আলিত মরিয়াই গিয়াছিল এবং আফজলেরও ডান পাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বাড়ীতে গিয়া যখন আমরা সের আলির মৃত্যুসংবাদ দিলাম, তখন বাবা তো রাগেই অস্থির, "আমি কি তোমাদিকে সর্ব্বদাই বলি নাই যে, বুড়ো বুনো শূকরের সঙ্গে ঝগড়া করিও না, ছোট ছোট শূকর মারা খুবই সহজ, কিন্তু তাহার গায়ের লোম কটা হইতে আরম্ভ করিলেই আর তাহাকে আক্রমণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমি নিজে এই শূকরটাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিতাম না।" একদিন আমি শিকার করিয়া ফিরিবার সময় একটা গোঁগানি শব্দ শুনিয়া এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে বাবাকে বন্দুকের গুলি খাইয়া একটা ঝোপের মধ্যে ছটফট করিতে দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, তোমার মা ও আফজল খাঁ উভয়েই শিকারীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। পরে আমাকে একটী দূরবর্ত্তী জঙ্গলে যাইতে পরামর্শ দিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। যে জঙ্গলে আমি এখন আশ্রয় লইলাম, তাহা হরিণে পূর্ণ ছিল এবং আমি ৩।৪ টী হরিণ প্রতিদিন মারিতাম। একদিন আমি একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড় মারিয়াছিলাম, সেটা হরিণ ও শূকরের চেয়ে ঢের ভাল লাগিয়াছিল। ইহার পর হইতে আমি নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদের গরু বাছুর ইত্যাদি মারিয়া খাইতাম।

একদা এক চাঁদনী রাত্রিতে পূর্ব্বদিনের মারা ষাঁড়টীকে খাইতে আসিয়া দেখিলাম যে, নিকটেই একটা মাচান বাঁধা রহিয়াছে। আমি যখন ষাঁড়টাকে মারিয়াছিলাম, তখন মাচানটা সেখানে ছিল না। ইহাতে আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি তখন অত্যন্ত আত্মনির্ভরশীল হইয়াছিলাম এবং ওদিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই খাইতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি দেখিলাম,

মাচানটার উপর একটি লোক রহিয়াছে। সে আমার দিকে একটা লাঠী বাড়াইয়াছিল। আমি পরে বুঝিয়াছিলাম সেটা লাঠি নয়, বন্দুক। সহসা একটা ভয়ানক শব্দ হইল এবং আমি মস্তকে আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি দেখিলাম একটা লোক বন্দুক হাতে করিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম যে, এক গুলিতে আমাকে মারিতে পারায় তাহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে। আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহার উরুদেশ কামড়াইয়া ধরিয়া বিড়াল যেরূপ ইন্দুর ধরিয়া ঝাঁকুনী দেয় সেইরূপে নাড়িতে লাগিলাম। যখন সে একেবারে অসাড় হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। আমার মুখে তাহার রক্ত লাগিয়াছিল, দেখিলাম যে তাহাতে একরূপ নূতন ধরণের আস্বাদ। আমি মনে করিলাম মানুষটাকে খাইতে আরম্ভ করি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাবার উপদেশ মনে পড়িল 'মানুষ কখনও খাইও না। মানুষ খাইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী'। বাবার কথা অনেক সময়েই ঠিক ঠিক ফলিয়াছে বলিয়া আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মানুষটাকে খাইতে বিরত হইয়া ষাঁড়টাকে খাইতে লাগিলাম।

ইহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে আমার এই জীবনকাহিনীতে সন্নিবেশিত হইতে পারে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই.

এই সময়ে সে দেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। গ্রাম্য লোকদিগের গরু বাছুর সব খাদ্যাভাবে মরিয়া যাইতেছিল ও গ্রামবাসীরা নিজেরাও অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছিল। আমি তিন দিন কোনও রূপ খাদ্যের যোগাড় করিতে না পারিয়া নদীর ধারে একটা ঝোপের আড়ালে চুপ করিয়া শুইয়াছিলাম। এমন সময়ে গ্রামের সুদখোর মোটা বেনেটা সেই নদীর ধারে আসিয়াছিল ও আমাকে দেখিতে না পাইয়া প্রায় আমার ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিল। আমি সরিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু বাঘ দেখিয়া সে ভয়ে এমন জোরে তাহার হাতের লাঠির দ্বারা আমার মাথায় আঘাত করিয়াছিল যে, সেই গুরুতর আঘাতে আহত হইয়া আমি আর আমার স্বাভাবিক ক্রোধ ও হিংস্র স্বভাবকে সংযত রাখিতে পারিলাম না।

ক্রোধে তাহার দিকে ফিরিয়া থাবা চালাইলাম। যদিও আমি বেশী জোরে থাবা মারি নাই, তবু তাহাতেই বেনের ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রথমে আমি তাহাকে খাইব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু দুদিন অনাহারে ছিলাম ও বেনে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল বলিয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া তাহাকে খাইতে আরম্ভ করিলাম।

ইহার পর হইতে আমার এক বিপদ উপস্থিত হইল। ভাল জিনিষের আস্বাদ পাইলে মানুষের মুখে যেমন আর মন্দ

জিনিষটী রুচে না, সেইরূপ মানুষের মাংসের আস্বাদ পাইয়া আমার আর অন্য কোন জন্তুর মাংসে রুচি রহিল না। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই আমি আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় ৫০ জন মানুষ মারিয়াছিলাম। এই সময়ে আমার একটা শৃগালের সহিত খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। কারণ সে মানুষের মাংস খাইতে খুব ভাল বাসিত এবং আমার আহারাবশিষ্ট মাংসে তাহার বেশ চলিয়া যাইত। আমি দেখিয়াছি, মানুষের মধ্যে বড় লোকদের ছেলের নিকটে এই রকম কতকগুলি উচ্ছিষ্টভোজী পোষ্য বাস করে। শৃগালের সহিত বন্ধুত্ব হওয়াতে আমার উপকারও খুব হইয়াছিল। যখনই আমাকে ধরিবার বা মারিবার জন্য গ্রামবাসীরা কোন আয়োজন করিত, তখন শৃগালটা কাছে কাছে থাকিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আসিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিত। সরকার বাহাদুর এই সময়ে আমাকে ধরিবার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমি তাহা শুনিয়া মনে মনে খুব আনন্দিত হইয়াছিলাম। শিকারীরা পুরস্কারের আশায় আমাকে ধরিতে অথবা মারিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমার বন্ধু শৃগালের ধূর্ত্ততার জন্য আমি সকল বিপদ হইতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলাম।

* * *

আমার এখন বোধ হয় যে, যদি শৃগালের সহিত আমি ঝগড়া না করিতাম, তাহা হইলে আজও পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তে জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইতে পারিতাম। একদিন শৃগালটা আসিয়া আমাকে বলিল "হুজুর! আপনি গত সপ্তাহে যে কাঠুরিয়াটাকে তাহার ঘরে ঢুকিয়া মারিয়াছিলেন, তাহার কথা মনে আছে ত? তাহার স্ত্রী দুইটী ছেলে লইয়া এখনও সেই ঘরেই বাস করিতেছে। দরজাটার এরূপ অবস্থা যে, আপনি একটু ঠেলা দিলেই পড়িয়া যাইবে।" আমি বলিলাম "বেশ তা আজ রাত্রিতে সেইখানেই শিকার করা যাইবে।" আমরা কাঠুরিয়ার বাড়ীর নিকটে গিয়া দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, কাঠুরিয়ার স্ত্রী খাবার প্রস্তুত করিয়া তাহার ছেলে দুটীকে খাইতে দিতেছে। বড় ছেলেটি এক খানা বাঁশ-কাটা দা লইয়া বলিল "আমি বড় হলে বাবার মত কাঠুরিয়া হইব। আচ্ছা মা! বাবা কোথায় গিয়াছেন? কবে আসিবেন?" এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "তিনি আর ফিরে আসবেন না। তবে একদিন আমরা সকলে তিনি যেখানে গেছেন, সেইখানেই যাব।" অন্য ছেলেটা জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কেন চলে গেলেন? তিনি কি এখানে সুখী ছিলেন না?" ইহাতে স্ত্রীলোকটা মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে আমি এই সব দরিদ্র লোকদিগকে কত কষ্ট দিয়াছি তাহা সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে

পারিলাম। সহসা আত্মগ্লানি ও অনুতাপে পুড়িতে পুড়িতে আমি মনে মনে ভাবিলাম, আর আমি মানুষ মারিব না। এমন সময়ে শৃগালটা বলিল "হুজুর আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? ছেলেটাকে দেখেত আমার জিব্ দিয়ে জল পড়ছে।" আমি বলিলাম "হতভাগা পেটুক দূর হ! আমি আর কখনও মানুষ মারিব না।" শৃগাল এই কথা শুনিয়া রাগিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমিও তাহার পিছনে পিছনে চলিয়া আসিলাম। কিছু দূরে এক স্থানে গাছের পাতা খুব ঘন করিয়া ছড়ান রহিয়াছে দেখিলাম। দেখিয়াই সেটা যেন কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। আমি ফাঁদ আছে সন্দেহ করিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু শৃগাল আমার এই ভয় দেখিয়া অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই পাতা-ঢাকা স্থানটার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু অর্দ্ধেক দূর যাইতে না যাইতেই ঝনাৎ করিয়া একটা শব্দ করিয়া ইঁদুরকলের মত দাঁতওয়ালা দুটা প্রকাণ্ড লোহার মুখ লাফাইয়া উঠিয়া আমার সম্মুখের ডান পাটা কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও নিজের সে পাটা মুক্ত করিতে পারি নাই। শৃগালটা বোধ হয় জানিত যে, তাহার ক্ষুদ্র শরীরের ভারে ফাঁদটা খুলিয়া যাইবে না এবং সেই জন্যই সে সাহস করিয়া তাহার উপর দিয়া গিয়াছিল। এখন সে আমাকে বলিল "হুজুর এ ফাঁদটার বিষয়ে আপনাকে আমি সাবধান করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু 'হতভাগা পেটুক' বলিয়া আপনার মত মহৎ লোককে কোন কথা বলিতে সাহস করি নাই।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। সে রাত্রি আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা অসহ্য। তবু তখনও আমি মনে মনে ইহাও আশা করিতেছিলাম যে, সকাল হইলে মানুষেরা আসিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিয়া আমার সকল কষ্টের শেষ করিয়া দিবে। কিন্তু সকালে মানুষেরা আসিয়া আমার সাধারণ-ব্যাঘ্রদুর্ল্লভ প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া আমাকে না মারিয়া একটা প্রকাণ্ড লোহার গরাদে যুক্ত প্রকাণ্ড পিঁজরার মধ্যে বন্দী করিল। পরে আমাকে গরুর গাড়ীর উপর করিয়া এবং অবশেষে খুব দ্রুতগামী রেলগাড়ীতে চড়াইয়া এখানে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছে। এখানে সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চীতা বাঘ, হস্তী, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু বন্দী আছে দেখিতেছি। ইহারাও হয়ত এক দিন বনে বনে আমার মত শিকার করিয়া বেড়াইত। এখন যেখানে আসিয়াছে লোকে তাহাকে চিড়িয়াখানা বলে। আমার এখানটা মোটেই ভাল লাগে না। তবে সুখের বিষয় এই যে, আমাকে আর বেশী দিন বাঁচিতে হইবে না। মরিলেই আমি এখন বাঁচি।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত-সম্রাটের প্রতিগমন।

১

এসেছিলে তুমি ভারত-সম্রাট্,
স্বদেশ আবার চলিলে ফিরিয়া,
দেখিলে ভারতে পথ, মাঠ, ঘাট
তোমারে দেখিয়া উঠিল মাতিয়া।

২

দেখিলে ভারতে ত্রিংশ কোটী নর,
দেখিলে তোমারে দেখিয়া সকলে
তুলিয়া উচ্ছ্বাসে কোটী কণ্ঠস্বর
গাইল তোমার সুযশ সকলে।

৩

বাল, বৃদ্ধ, যুবা, পুরাঙ্গনা যত
তোমারে দেখিতে আসিল ছুটিয়া,
পথের ভিখারী, অন্ধ খঞ্জ কত
উঠেছিল তারা আনন্দে মাতিয়া।

৪

যেতেছ চলিয়া যাও হে নৃপতি,
মনে রেখ চির ভারতের কথা,
মনে রেখ চির-রাজভক্ত জাতি
গাবে চিরদিন তোমার বারতা।

৫

মনে রেখ স্মৃতি ভারতনারীর,
মনে রেখ তুমি তাহাদের কথা,
মনে রেখ তারা মহিষী "মেরীর"
শত মুখে গাবে যশোগুণ-গাথা।

৬

পরাধীনা নারী গাবে তবু তারা
গৌরব তোমার শত কণ্ঠে সবে,
লাঞ্ছিতা বিধবা—মুখে নাহি সাড়া,
তারাও তোমার যশোগুণ গাবে।

৭

দেখিও তাদের বলি হে নৃপতি,
দেশাচারে তারা সদাই দলিত,
দেখিও তাদের চিরদুঃখী জাতি,
দেখিও তারাই চির নির্য্যাতিত।

৮

শিখেনি ভারত এখনো শিখেনি,
নারীর মর্য্যাদা এখনো বুঝে না,
তাই রেখ মনে—ভারতরমণী
তোমারে কখন ভুলিয়া রবে না।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

নূতন সংবাদ।

১। আমেরিকার সিকাগো নগরে দুঃস্থ ও রুগ্ন কবিদিগের জন্য একটী আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছে। যে সকল কবি এক সময় কবিতা-রচনা-নৈপুণ্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা রোগাক্রান্ত হইয়া নিরুপায় হইলে তাঁহাদিগকে ঐ আশ্রমে আশ্রয় প্রদান করা হইবে।

২। বিগত ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টার-

মিডিয়েট্‌ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রী দুইটী বিশিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

প্রিয়নাথ দত্তবৃত্তি।

জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ—কটক মডেল বালিকা বিদ্যালয়।

ইন্টারমিডিয়েট্‌ পরীক্ষা।

প্রিয়নাথ দত্তবৃত্তি।

ক্ষেমদা রায়—বেথুন কলেজ।

৩। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে বাঙ্গালোর, মহীশূর, হাসান্‌, শিমাগো, কোলার, তুমকর, চিতলড্রুগ্‌ ও কাডুর নগরে বালকদিগের ধূমপান-নিষেধক আইন জারি হইবে।

৪। এইবার করাচী বন্দরের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। ইহার আয়তনও বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাই দিল্লী রাজধানীর বন্দর হইবে।

৫। দেখিতে দেখিতে আবার ইংরাজি ১৯১১ খৃষ্টাব্দ আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্ত কালজলধিবক্ষে ধীরে ধীরে বিলীন হইল। নানা কারণে এই অব্দটি বহুকাল আমাদিগের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে। তন্মধ্যে ভারত-সম্রাটের শুভাগমন, বঙ্গচ্ছেদ নিরাকরণ ও রাজধানী পরিবর্ত্তন, এই গুলি প্রধান। ইটালী ও তুরস্কের সমর, চীনরাজ্যের মহাবিপ্লব, পারস্য রাজ্যের রাজনৈতিক দুরবস্থা প্রভৃতি ঘটনার জন্যও ইহা জগদ্‌বাসীর স্মরণীয় থাকিবে।

বামারচনা।

রাজ-অভ্যর্থনা।

(১)

হইল ভারত-গগন উজল
তরুণ অরুণ-কিরণে আজি,
নিশি অবসানে আসিল দিবস
মনোহর বেশে, আজি গো সাজি।

(২)

ও কান মুকুল ফুটিল আবার
মধুর প্রভাতে শিশির-মাখা;
গুঞ্জরে ভ্রমর আদরে সোহাগে
ফোটা ফুল' পরে কাঁপায়ে পাখা।

(৩)

মঙ্গল সঙ্গীত গাহিছে মধুর
কোকিল পাপিয়া কাঁপায়ে শাখা,
বহিছে তটিনী উল্লাসে মাতিয়া
সৈকতে আঁকিয়া রজত-রেখা।

(৪)

ভারতের আজি বড় শুভ দিন,
এলেন নূতন ভূপতি দ্বারে,
দুঃখিনীর আজি দুঃখ ঘুচাইতে
যতনে মুছাতে নয়নধারে।

(৫)

এস মহারাজ! এস মহারাণি!
দীনা অভাগিনী তনয়া-বাসে,
কত মাস, বর্ষ, যুগ, যুগান্তর
ভারত যাচিছে আপন পাশে।

(৬)

পিতা মাতা তার দেখিতে আরেক
এসেছেন যদি কৃপা বরষণে,
এত দিনে আশা মিটিল তাহার
এস রাজা রাণি! তারি ভবনে।

(৭)

মলিন বদনে ফুটেছে যে হাসি
তোমারি দয়ায় এ শুভ দিনে,
কৃতজ্ঞ ভারত সপুত্র আজি গো!
নমে মহারাজ তোমারি চরণে!

(৮)

এস মহারাজ! এস মহারাণি!
সন্তান-ভবনে লইতে পূজা,
ত্রিশ কোটী কণ্ঠে গাহিছে উচ্ছ্বাসে
"জয় মহারাণি! জয় মহারাজা!"

শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরাণী।

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।

(১)

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
উপরে মেঘের স্তর, মৃদু ছায়া তার পর,
রবির রক্তিম আভা তায়।

২

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
বাতাস আর বহে নাকি যেন স্তব্ধ হয়ে রহে
ক্ষীণা নদী ধীরে ব'য়ে যায়।

(৩)

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
তরণী উপরে নেয়ে কি সুরে উঠিছে গেয়ে
পরাণ টানিছে যেন তায়।

(৪)

সলিলে রক্তিমা মেখে, প্রকৃতি দিয়াছে এঁকে,
বিশাল আকাশপট তায়।
শান্তির কোমল ছায়ে ওপারে শ্যামল ভূঁয়ে
মাথামাখি লতায় পাতায়।
আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।

(৫)

তরুকোলে রাখি মাথা, ব্রততী কহে কি কথা,
কোকিলা আপন মনে গায়,
শ্যাম সন্ধ্যা ধীরে এসে, দাঁড়ায় ধরার পাশে
ঢুলে ঢুলে ফুল পড়ে গায়।

(৬)

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
দুটি মেয়ে নদীতীরে চাহিয়া রয়েছে মোরে
অঞ্চল উড়িছে ধীরে বায়।

হাসি হাসি সুধা মুখ, হৃদয়ে নাহিক দুখ,
বিষাদ ভাবনা নাহি তায়।
সুদূরে আকুল স্বরে কে যেন ডাকিছে কারে,
কাছে এসে বায়ে ভেসে যায়।
আজ প্রাণ কি জানি কি চায়।

(৭)

আজি দিবা অবসানে, কাহারে বা পড়ে মনে,
পরাণ ছুটিয়া কেন যায়?
কে কি বলে কাণে কাণে,
বায়ু কারে ডেকে আনে
করিবারে পাগল আমায়।

(৮)

ফুল কেন ভাসে ঢেউয়ে, পাখী কেন উঠে গেয়ে,
কেন তরী ব'য়ে যায়।
নদী কেন বহে ধীরে, ছায়া কেন পড়ে নীরে,
ম্লান রবি সকরুণ চায়?

(৯)

ভ্রমি বিশ্ব একা একা, চাহে প্রাণ কার দেখা,
হিয়া ঢাকা তীব্র বাসনায়।
আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়,
মহকুমা মানিকগঞ্জ, জেলা ঢাকা।

রাজসূয়-যজ্ঞ।

আজি বহু যুগ-যুগান্তর পর,
ইউরোপ হ'তে ইংলণ্ড-ঈশ্বর,
প্রথম আসি এ ভারত-ভূমে,
সম্রাজ্ঞীর সহ ভারত-সম্রাট্—
রাজসূয় যজ্ঞ মহান্ বিরাট—
করিছেন সুখে বিপুল ধূমে!!

যেখানে দ্বাপরে রাজসূয়-যজ্ঞ
করেছিলা রাজা পাণ্ডব ধর্ম্মজ্ঞ,
সেই দিল্লী ধাম হস্তিনাপুরে
ভারতবাসীর সৌভাগ্যে আবার,
পঞ্চম-জর্জ্জের এ যজ্ঞ ব্যাপার
হতেছে কতই বরষ ঘুরে।

নিজাম, বরদা, ভোট, পাতিয়াল,
কাশ্মীর, সিন্ধিয়া, বেগম ভোপাল,
যোধপুর-ভূপ, কাশীর রাজ।
বিকানীরপতি, রাণা উদিপুর,
অযোধ্যা-নবাব, রাজা ত্রিবাঙ্কুর,
করেছেন সবে কুর্ণীশ আজ।

ধন্য ভাগ্যবান্! ধন্য মহারাজ!
অদ্বিতীয় তুমি একছত্রী আজ,
সমকক্ষ তব জগতে নাই।
যত রাজা রাণী, নবাব বেগম,
দিতে রাজকীয় উচিত সম্ভ্রম,
সমাগত সবে এ যজ্ঞে তাই।

ভারতীয় প্রজা মোরা সর্ব্বজনে,
নতশিরে রাজদম্পতীচরণে,
ভক্তি-অর্ঘ দিনু অঞ্জলি ভরি।
আমরা কেবলি এই ধ্রুব জানি,

রাজা নারায়ণ, নারায়ণী রাণী,
জাতি ধর্ম্ম আদি কিছু না ধরি।

দাগরে কামান, দাগ গোলন্দাজ!
গুড়ুম্ গুড়ুম্ হোক আওয়াজ,
দেখুক সর্ব্বত্র সকল জন।
সম্রাটেরে রাজ-চক্রবর্ত্তী ব'লে
মানিতে হাজির এই যজ্ঞস্থলে,
রাজভক্ত যত প্রকৃতিগণ।

উড়াও রে পতাকা, পতাকাবাহী!
দেখুক সকলে সবিস্ময়ে চাহি,
একই রাজার নিশান-তলে,—
হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান,
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মী জাতি সে নানান
সম্মিলিত সবে সদল-বলে।

যত বাদ্যকর! বাজা সুখে আজ,
ঢাক, ঢোল, কাঁশী, সেতার, এস্রাজ,
ললিত সানাই, মৃদঙ্গ, ভেরী।
—সুরে জয়ধ্বনি উঠুক বিরাট,
জয় "পঞ্চম জর্জ্জ্" জয় সম্রাট!!
জয় ভারতের সম্রাজ্ঞী "মেরী"!!

বাজাও বৃটিশ বাদ্যকরগণ!
সজোরে সঘনে বৃটিশ বাদন,
হইয়ে সকলে প্রফুল্ল-প্রাণ।
ভারতবাসীর প্রাণের প্রার্থনা,
বৃটনের গতে বাজাও বাজনা
"গড্ সেভ্ দি কিং কুইন্" গান।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

সম্রাট আগমনে।

নিজে দয়া বিলাইতে,
প্রজা-অশ্রু মুছাইতে,
আসিয়া ইংলণ্ড হতে
করিলেন মঙ্গল-ঘোষণ।
করে লয়ে রাজভার,
পার হয়ে পারাবার,
ত্যজি পুরি আপনার
আসিলেন ভারতরঞ্জন্।
উঠালেন বঙ্গচ্ছেদ,
ঘুচালেন মন-খেদ,
রাজরাণী সত্যবেদ
রেখো সবে যতনে স্মরণ।

স্বচক্ষে দেখিল নর
ভিক্টোরিয়া বংশধর
হয়েছেন দণ্ডধর
শিরে ধরি মুকুট ভূষণ।
ভেবে দেখ আগে পাছে,
তাঁরে দিবে কিবা আছে,
হৃদিভরা ভক্তি কাছে
ধরামাঝে নাহি কোন ধন।
ভারত সোণার খনি,
বহু-রত্ন-প্রসবিনী,
উঠগো দরিদ্রা ধনি,
লহ তাঁরে করিয়া বরণ।

সম্রাট মহিষী-সঙ্গে,
রোধ করি বঙ্গভঙ্গে,
আসিছেন দীন বঙ্গে
দাও ভক্তি বিধিমতধন।
সন্তান সমান প্রজা
পালিও যতনে রাজা,
দেশে দেশে শুকা ধ্বজা
ব্যর্থ করে রাজ-আগমন।
রাজার করুণা আশে
দাঁড়াইয়া পথপাশে
জানাতে রাজসকাশে
সকলের মনের বেদন।
পাইবে অভয় বাণী
মনে হেন অনুমানি
দীন দুঃখী যত প্রাণী
সবে আজি আনন্দে মগন।
পাণ্ডব-গৌরব যথা
রাজসূয় যজ্ঞ তথা
হয়েছিল, সে বারতা
কে না জানে মাঝে ত্রিভুবন।
অনুসরি সে কাহিনী
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী
আদেশিলে গুণমণি
ভিত্তি তার করিলে স্থাপন।
উদার রাজা মহান্
করুন হেন বিধান,
যেন অন্ন-সংস্থান
করিবারে পারে প্রজাগণ।
শিল্পোন্নতি যাতে হয়
বাণিজ্য সুগম হয়,
করো রাজা সদাশয়
যুক্ত করে এই নিবেদন।

শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী।
১৮।৩, অক্রূর দত্তের গলি।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৭ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।